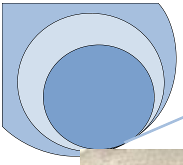
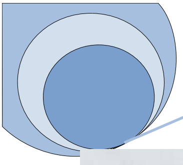


জলপদ্ম

হুমায়ূন আহমেদ



ছোটবেলায় ইলা একবার জলপদ্ম দেখেছিল। মাঝ পুকুরে সাঁতার দিচ্ছে টকটকে লাল রঙের কি আশ্চর্য এক ফুল! যে ফুলের কাছে যাওয়া যায় না, যাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না — শুধু দূর থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়।

ইলা বড় হল জলপদ্মের স্বপ্ন চোখে নিয়ে। তার সেই স্বপ্নের কথা কেউ জানল না। সব স্বপ্নতো বলে বেড়াবার নয়। কিছু স্বপ্ন হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে রাখতে হয়। ইলা লুকিয়েই রেখেছিল — লুকিয়ে রাখতে রাখতে একদিন সে নিজেই একটা জলপদ্ম হয়ে গেল। এই আশ্চর্য রূপান্তর কি করে হল সেই গল্পই জলপদ্মের গল্প।

ISBN 984-458-049-8



হুমায়ূন আহমেদের জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সনে ময়মনসিংহের নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ গ্রামে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিমার কেমিষ্ট্রিতে গবেষণা করে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যাপনারত। লেখালেখি করছেন ১৯৭২ সন থেকে। ১৯৯২ তে লেখালেখির ২০ বছর পূর্ণ করেছেন সগৌরবে।

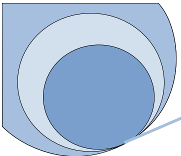
উপন্যাস, গল্প, নাটক, টিভি নাটক, কল্প বিজ্ঞান— হুমায়ূন আহমেদ যেখানেই হাত দিয়েছেন তা হয়ে উঠেছে পাঠক ও দর্শক নামক জনগোষ্ঠীকে আলোড়িত ও বিমোহিত করার সোনার কাঠি। তাইতো সব কিছুতেই পেয়েছেন অসম্ভব জনপ্রিয়তা।

বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে হুমায়ূন আহমেদ স্বভাবতই একটি বিশিষ্ট নাম। সমসাময়িককালে তার মতো জনপ্রিয় পাঠক নন্দিত লেখক আর আসেনি। এক বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এদেশে তিনিই প্রথম সাহিত্যে জনপ্রিয়তার মাত্রাটি যোগ করেছেন— এ কথা এক বাক্যে স্বীকার করতে হয়।

হুমায়ূন আহমেদের লেখায় কিছুটা রোমান্টিক মধ্যবিত্ত বিলাসী হাওয়া থাকলেও তার বিষয়ে নিহিত রয়েছে মানুষের জীবনের গভীর মর্মবাণী। তার রচনার বড় বৈশিষ্ট্য তার স্বচ্ছ বাহুল্যহীন রসময় ভাষা। মধ্যবিত্ত বৃত্তে বিচরণকারী তার চরিত্রগুলিরও রয়েছে বিশিষ্টতা। অন্যদিকে তার কল্পবিজ্ঞান (Science Fiction) বইগুলোতে রয়েছে তার নিজস্ব ভঙ্গী ও মনোমুগ্ধকর রচনাশৈলী। এদেশে এখনো তাই তিনি অদ্বিতীয়।

বলাই বাহুল্য তার সবরকম লেখা অত্যন্ত শালীন ও সুরুচিপূর্ণ। বাংলাদেশের বইকে জনপ্রিয় করা এবং বাজার তৈরীতে হুমায়ূন আহমেদ তাই হয়ে আছেন এক ইতিহাস সৃষ্টির মাইল ফলক।

বাংলা একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, শিশু একাডেমী পুরস্কার, মাইকেল মধুসূদন পদক, ওসমানী পদক, অলক্ত সাহিত্য পদক, বাচসাস পুরস্কার, হুমায়ূন কাদির স্মৃতি পুরস্কার, কুমিল্লা ফাউন্ডেশন পদক, দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা স্মৃতি পদক ইত্যাদিতে সম্মানিত। সম্প্রতি আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'অনারারী ফেলো ইন রাইটিং' সম্মানেও সম্মানিত।

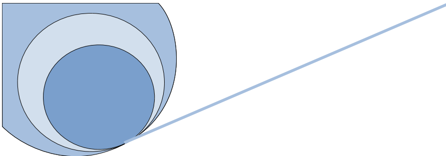


জলপদ্ম

হুমায়ূন আহমেদ

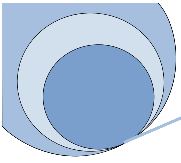


সময় প্রকাশন





"উদাসীন দেখ আকাশের গায়ে মেঘেরা ছড়ায় সোনা
কথারা আমার গৃহহারা, করে ছায়াপথে আনাগোনা"
[ওফেলিয়া ; বিষ্ণু দে]



আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই

উপন্যাস

আজ চিত্রার বিয়ে
এই মেঘ, রৌদ্রছায়া
এবং হিমু . . .
শ্রাবণমেঘের দিন
তিথির নীল তোয়ালে
নবনী
আশাবরী
জলপদ্ম
আয়নাঘর
মন্দ্রসপ্তক
মিসির আলির অমীমাংসিত রহস্য
আমাদের শাদা বাড়ী
In Blissful Hell
A Few Youths In The Moon

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

শূন্য
ইমা
ওমেগা পয়েন্ট

গল্পগ্রন্থ

জলকন্যা
শ্রেষ্ঠ গল্প

স্মৃতিকথা/অন্যান্য

যশোহা বৃক্ষের দেশে
এলেবেলে ১ম পর্ব
এলেবেলে ২য় পর্ব

সমগ্র

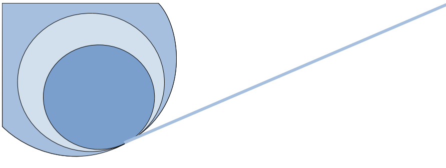
হুমায়ূন ৫০
স্বপ্ন ও অন্যান্য

কিশোরসাহিত্য

ছেলেটা

শিশুতোষ

বোকাভূ
পরীর মেয়ে মেঘবতী



উৎসর্গ

সাধারণ হয়েও অসাধারণ
আমার অতি প্রিয় একজন
ময়মনসিংহের **সালেহ ভাই**
করকমলে।

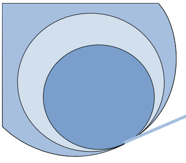
১

....

রিকশা থেকে নামার সময় ইলা লক্ষ্য করল তার হাত-পা কাঁপছে। বুক ধকধক করছে। হাতের তালু ঘামছে। এত ভয় লাগছে কেন তার? ভয় কাটানোর জন্যে কিছু একটা করা দরকার, কি করবে বুঝতে পারছে না। বাড়িওয়ালার ভাগ্নে হাসান একতলার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। ইলা তার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল। কারো দিকে তাকিয়ে হাসলে হাসির জবাব দিতে হয়, কিন্তু হাসান কখনো তা করে না। আজও করল না। চোখ ফিরিয়ে নিল। এই ছেলে কখনো চোখে চোখে তাকায় না। সব সময় মাথা নিচু করে থাকে। সে যদি ইলার দিকে তাকিয়ে একটু হাসত তাহলে ইলার ভয় খানিকটা কমত। রঙ জ্বলে যাওয়া হলুদ রঙের ফুল হাওয়াই শার্ট পরা, ফ্যাকাসে চেহারার এই ছেলে কখনো তা করবে না।

চার টাকা ভাড়া ঠিক করা। ইলা রিকশাওয়ালাকে পাঁচ টাকার একটা নোট দিল। একটাকা ফেরত নেবার জন্যে অপেক্ষা করল না। এত সময় নেই। অতি দ্রুত তাকে তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠতে হবে। তার মন বলছে — ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে। খুব ভয়ংকর! যদিও সে জানে কিছুই ঘটে নি। দিনে দুপুরে কি আর ঘটবে? ফ্ল্যাটে অন্তু মিয়া আছে। তাকে বলা আছে যেন সে কিছুতেই দরজা না খোলে। আগে জিজ্ঞেস করবে, 'কে?' পরিচিত কেউ হলেও বলবে — 'বিকালে আসবেন। বাসায় কেউ নেই।'

অন্তু মিয়ার বয়স সাত বছর। এত বুদ্ধি কি তার আছে? কলিং বেলের শব্দ হতেই সে বোধহয় দরজা খুলে দিয়েছে। গত মঙ্গলবারে তাদের পেছনের বাড়ির তিনতলা 6/B ফ্ল্যাটে এ রকম হল। ভদ্রচেহারার দুটি ছেলে এসে কলিং বেল টিপেছে। ভদ্রমহিলা দরজার কাছে আসতেই একজন বলল, আপা, আমি মিটার চেক করতে এসেছি। ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন। ছেলে দুটি শান্তমুখে ঢুকল। চশমা পরা ছেলেটি মিষ্টি গলায় বলল, আপা, চেঁচামেচি করবেন না। এক মিনিট সময় দিচ্ছি। গয়না এবং টাকা-পয়সা রুমালে বেঁধে আমাকে দিন। আমার সঙ্গে পিস্তল আছে। বলেই সে হাসিমুখে পিস্তল বের করল। ভদ্রমহিলা একবার শুধু তাকালেন



পিস্তলের দিকে, তারপরই অজ্ঞান। ভাগ্যিস, জ্ঞান হারিয়েছিলেন নয়ত টাকা-পয়সা, গয়না-টয়না সব যেত। নিজেই স্টীলের আলমিরা খুলে সব বের করে দিতেন। জ্ঞান হারানোর জন্যে কিছু করতে পারলেন না। ওরাও চাবি খুঁজে না পেয়ে টেলিভিশনটা নিয়ে চলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ইলার মনে হল নিশ্চয়ই তাদের ফ্ল্যাটেও এরকম কিছু হয়েছে। অন্তু মিয়াকে খুন করে জিনিসপত্র সব নিয়ে চলে গেছে। রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। অন্তুর মুখের উপর ভনভন করে উড়ছে নীল রঙের মাছি। এই মাছিগুলিকে সাধারণত দেখা যায় না, শুধু পাকা কাঁঠাল এবং মৃত মানুষের গন্ধে এরা উড়ে আসে। ছিঃ এসব কি ভাবছে ইলা!

ফ্ল্যাটের দরজার কাছে ইলা থমকে দাঁড়াল। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। পর্দা ঝুলছে। ইলার ঢুকতে সাহস হচ্ছে না। এমনভাবে বুক কাঁপছে যে মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে। সে দরজা ধরে নিজেকে সামলাল, ভয়ে ভয়ে ডাকল, অন্তু, অন্তু মিয়া! কেউ জবাব দিল না। ইলা নিঃশ্বাস বন্ধ করে পর্দা সরিয়ে ঘরে উঁকি দিল। সোফায় পা তুলে বিরক্তমুখে জামান বসে আছে। এত সকালে সে কখনো অফিস থেকে ফেরে না। রোজই ফিরতে সন্ধ্যা হয়। জামান গম্ভীর গলায় বলল, কোথায় গিয়েছিলে?

ইলা জবাব দিল না। তার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয় নি। এখনো বুক ধড়ফড় করছে। এটা বোধহয় এক ধরনের অসুখ। নয়ত শুধু শুধু সে এত ভয় পাবে কেন? জামান বলল, কথা বলছ না কেন? ছিলে কোথায়?

'নিউ মার্কেট গিয়েছিলাম।'

'দুপুরবেলা হুটহাট করে নিউ মার্কেটে যাবার দরকার কি? দু'দিন আগে 6/B ফ্ল্যাটে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল। নিউ মার্কেটে গিয়েছিলে কেন?'

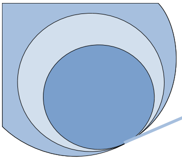
'উল কিনতে।'

'উল দিয়ে কি হবে?'

'একটা সোয়েটার বানাব।'

'সোয়েটার-টোয়েটার আজকাল কেউ ঘরে বানায় না। শুধু শুধু সময় নষ্ট। বাজারে সস্তায় পাওয়া যায়। দেখি ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও।'

পানি আনতে গিয়ে ইলা লক্ষ্য করল অন্তু ভেতরের বারান্দায় রেলিংয়ের দিকে মুখ করে বসে আছে। কিছুক্ষণ পর পর শরীর যেভাবে ফুলে ফুলে উঠছে তাতে মনে হচ্ছে কাঁদছে। জামান কি কিছু বলেছে অন্তুকে? থাক, এখন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। পরে জিজ্ঞেস করা যাবে।



জামান পানির গ্লাস হাতে নিতে নিতে বলল, অন্তুকে তুমি কি বলে গিয়েছিলে? সে কিছুতেই দরজা খুলবে না। যতবারই বলি — 'আমি, দরজা খোল' ততবারই সে বলে — 'কেডা?' চড় লাগিয়েছি।

ইলা বলল, আহা মারলে কেন? ছোট মানুষ!

'ছোট হলে কি হবে, ঝাড়ে বংশে বজ্জাত। খুব কম করে হলেও আধ ঘণ্টা দরজা ধাক্কিয়েছি। সে বুঝতে পারছে আমি, তারপরেও দরজা খুলবে না। দেখি পরিষ্কার একটা রুমাল দাও তো। বেরুব।'

'কোথায় যাবে?'

'জয়দেবপুর। ফিরতে দেরি হবে। রাত বারটা–একটা বেজে যাবে। বাড়িওয়ালাকে বলবে দয়া করে যেন গেটটা খোলা রাখে। ব্যাটা উজবুক, দশটা বাজতেই গেট বন্ধ করে দেয়। এটা যেন মেয়েদের হোস্টেল।'

ইলা ক্ষীণ গলায় বলল, আমি কি মা'র বাসা থেকে একবার ঘুরে আসব? শুনেছি ভাইয়ার জ্বর। ভাইয়াকে দেখে আসতাম।

'সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরে আসতে পারলে যাও। এত রাতে একা ফেরার প্রশ্নই উঠে না। শহরের অবস্থা যা মেয়েদের তো ঘর থেকে বের হওয়াই উচিত না।'

'একা ফিরব না। ভাইয়া পৌঁছে দেবে।'

'একটু আগে না বললে ভাইয়ার জ্বর, রোগী দেখতে যাচ্ছ। যাকে দেখার জন্যে যাচ্ছ সে–ই তোমাকে পৌঁছে দেবে এটা কেমন কথা। যা বলবে লজিক ঠিক রেখে বলবে।'

জামান উঠে দাঁড়াল। বিরক্তমুখে বলল, অন্তুর ঠোঁট বোধহয় কেটে গেছে। ঘরে ডেটল আছে। ডেটল লাগিয়ে দিও। আমি চললাম। দরজা ভাল করে বন্ধ কর।

অন্তুর ঠোঁট ভয়াবহভাবে কেটেছে। দু'ভাগ হয়ে গেছে। রক্তে তার শার্ট ভিজেছে। যেখানে বসে আছে সেই মেঝে ভিজেছে। রক্ত এখনো বন্ধ হয় নি। চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। সমস্ত মুখ ফুলে চোখ দু'টা ছোট ছোট হয়ে গেছে। অন্তুকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। ইলা হতভম্ব হয়ে গেল।

'ঠোঁট কাটল কিভাবে? পড়ে গিয়েছিলি?'

'হুঁ।'

'কিভাবে ঠোঁট কাটল?'

অন্তু জবাব দিল না। এতক্ষণ সে কাঁদে নি। এইবার কাঁদতে শুরু করেছে। এ বাড়ির পুরুষ মানুষটাকে সে যমের মত ভয় পায়। তার সম্পর্কে নালিশ করতে ভয় লাগে বলে সে নালিশও করছে না। নয়ত বলত, চড় খেয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে ঠোঁট

কেটে গেছে।

'ব্যথা করছে অন্তু?'

'হুঁ।'

'খুব বেশি?'

'হুঁ।'

'চুপ করে বসে থাক। তোকে এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে পাঠাব। এই কাপড়টা ঠোঁটের উপর চেপে ধরে রাখ তো। রক্ত বন্ধ হোক। আমি বাড়িওয়ালার ভাগ্নেটাকে ডেকে নিয়ে আসি।'

চিন্তিত মুখে ইলা বসার ঘরে ঢুকল। সে ভেবে পাচ্ছে না, দরজা খোলা রেখে সে নিজেই একতলায় যাবে, না অন্তুকে পাঠাবে। অন্তুর যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে না সে একা একা নিচে যেতে পারবে। কিন্তু দরজা খোলা রেখে সে-ই বা যাবে কিভাবে? অন্তু এখন কাঁদছে শব্দ করে। ইলার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। আট ন'বছরের বাচ্চা একটা ছেলে। এরকম ব্যথা পেলে তার মা তাকে কোলে নিয়ে হাঁটত।

'অন্তু মিয়া!'

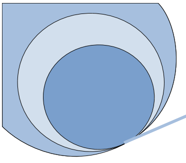
'হুঁ।'

'দরজা বন্ধ করে বসে থাক, আমি নিচ থেকে আসি। যাব আর আসব। মুখ থেকে কাপড়টা সরা তো — দেখি রক্ত বন্ধ হয়েছে কি-না।'

রক্ত বন্ধ হয় নি। ক্ষীণ ধারায় এখনো পড়ছে। অন্তু মাঝে মাঝে জিভ বের করে রক্ত চেটে চেটে দেখছে। ইলা বলল, রক্ত চেটে খাচ্ছিস কেনরে গাধা? রক্ত কি খাবার জিনিস? ইলা চিন্তিত মুখে নিচে গেল। হাসানকে পাওয়া গেল না। বাড়িওয়ালার স্ত্রী সুলতানা বললেন, গাধাটাকে এক কেজি চিনি আনতে বলেছিলাম। চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে, ফেরার নাম নেই। কখন হুজুরের ফিরতে মর্জি হবে কে জানে? আসুক, আসলে পাঠায়ে দিব।

ইলা বলল, খালা, গেটটা আজ একটু খোলা রাখতে হবে। ও জয়দেবপুর গেছে, ফিরতে রাত হবে।

'হাসানকে বলে দিও। গেটের চাবি তার কাছে থাকে। আর তোমাকেও একটা কথা বলি, দিনকাল খারাপ — তোমার বয়স অল্প। একা একা থাক — এটা ঠিক না। কখন কি ঘটে যায়। পিছনের বাড়ির টেলিভিশন নিয়ে গেছে বলে যা শুনেছ সব ভুয়া। রেপ কেইস। তিনটা ছেলে ঢুকেছে। ঢুকেছে ১২ টার সময়, গেছে তিনটায়। কতক্ষণ হল? তিন ঘণ্টা। একেক জনের ভাগে এক ঘণ্টা। বুঝতে পারলে?'



সুলতানা চোখ ছোট করে রহস্যময় ইংগিত করলেন। ইলা চমকে উঠল — এমন কুশ্রী ইংগিত এমনভাবে কেউ করে?

'খালা, আমি যাই।'

'আহা দাঁড়াও না। বিস্তারিত শুনে যাও। এরা আসল ঘটনা চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। চাপা দিলেই কি চাপা দেয়া যায়। বলে কি টেলিভিশন নিয়ে গেছে। টেলিভিশন নিয়ে গেলে বাড়িতে ডাক্তার আনা লাগে? ঐ বাড়িতে দুনিয়ার আত্মীয়স্বজন এসে উপস্থিত হয়েছে। মরাকান্না! ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টেলিভিশন এমন কি জিনিস যে গুষ্টিসুদ্ধা মরাকান্না কাঁদবে। তুমি আমাকে বল।'

'খালা, অন্তু একা আছে। আমি যাই।'

'যাই যাই করছ কেন? ঘটনা শুনে যাও — মেয়েটার হাসবেন্ডকে দেখলাম দু'জনে ধরাধরি করে বেবিটেক্সিতে তুলল। একটা টেলিভিশন নিয়ে গেলে এই অবস্থা হয়! তুমিই বল। আমি কি ভুল বললাম?'

'জ্বি—না।'

'তোমার বয়স কম। নতুন বিয়ে। খুব সাবধানে থাকবে। পারতপক্ষে বারান্দায় যাবে না। তোমার আবার বিশ্রী স্বভাব বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করা। এইসব রেপিস্টদের নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েগুলির দিকে নজর থাকে বেশি — সাবধান। খুব সাবধান — । চা খাবে?'

'জ্বি—না।'

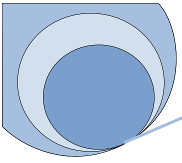
'খাও না।'

'আরেকদিন এসে খেয়ে যাব।'

'আসবে — নিজের বাড়ি মনে করে আসবে। বাড়িওয়ালা–ভাড়াটে সম্পর্ক আমার না। আমার বাড়িতে যে এসে উঠবে — সে আমার আপনা মানুষ। তার ভালমন্দ আমার ভালমন্দ। মাসের শেষে টাকা নিয়ে দায়িত্ব শেষ — এই জিনিস আমাকে দিয়ে হবে না। সবাইকে দিয়ে সব জিনিস হয় না।'

সুলতানা হাঁপাতে লাগলেন। শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমে যাওয়ায় একনাগাড়ে বেশিক্ষণ কথা বলতে কষ্ট হয়। কষ্ট হলেও তিনি কথা বলেন। ধর্ষণ জাতীয় খবরে তিনি বড় মজা পান। এইসব খবর আগে শুধু কাগজে পড়তেন। এখন বাড়ির কাছে ঘটে যাওয়ায় বড় ভাল লাগছে।

ইলা আবার বলল, আসি খালা। বলে আর দাঁড়াল না। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। সুলতানা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। ইলা মেয়েটা অতিরিক্ত রকমের সুন্দর। তাঁর বড় ছেলের জন্যে তিনি অনেকদিন ধরে একটা সুন্দর মেয়ে খুঁজছেন।



পাচ্ছেন না। সুন্দর মেয়েগুলি গেল কোথায়? যে ক'টাকে পাওয়া যায় সব ক'টার বিয়ে হওয়া। মায়ের পেট থেকে পড়েই এরা বিয়ে করে ফেলে না-কি? কোন মানে হয়?

আশ্চর্য, অন্তুর ঠোঁট থেকে এখনো রক্ত পড়ছে।

'অন্তু, বেশি ব্যথা করছে?'

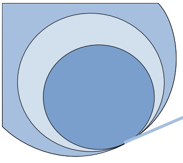
'হুঁ।'

'হাসান এসেই তোকে নিয়ে যাবে। এক্ষুণি আসবে, খবর দিয়ে এসেছি। শুয়ে থাকবি খানিকক্ষণ? বিছানা করে দেই?'

অন্তু ঘাড় কাত করল। এবং কেন জানি প্রবল কষ্টের মধ্যেও হাসার চেষ্টা করল। অন্তুর বিছানা বলতে ভাঁজ করা একটা মাদুর। একটা বালিশ পর্যন্ত ছেলেটার নেই। ইলা জামানকে একবার বলেছিল, একটা বালিশ নিয়ে এসো। বেচারা বালিশ ছাড়া ঘুমায়। জামান গম্ভীর গলায় বলেছে — এদের বালিশ দরকার হয় না। খামোকা বড়লোকি শেখাতে হবে না। ইলা ঠিক করে রেখেছে এবার মা'র বাসায় গেলে একটা বালিশ আর একটা কাঁথা নিয়ে আসবে।

মাদুর বিছাতে গিয়ে ইলা দেখল, মেঝেতে কার্পেটের উপর জামানের মানিব্যাগ। পেটমোটা কালো রঙের মানিব্যাগ। যখন চেয়ারে বসেছিল তখন নিশ্চয়ই পকেট থেকে পড়ে গেছে। মানিব্যাগ পকেট থেকে পরে যাবে, জামান টের পাবে না, এরকম হবার কথা না। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে খুব সাবধানী। মানিব্যাগে বেশ কিছু পাঁচ শ' টাকার নোট রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। কতগুলি নোট? গুনে দেখতে ইচ্ছে করছে।

জামান নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তা করছে। এতগুলি টাকা। দুশ্চিন্তা করারই কথা। সে কি বুঝতে পেরেছে মানিব্যাগ হারিয়েছে? নিশ্চয়ই খুব ঝামেলা হয়েছে। রিকশা থেকে নেমে রিকশা ভাড়া দিতে গিয়ে হঠাৎ দেখল মানিব্যাগ নেই। এইসব ক্ষেত্রে রিকশাওয়ালারা বিশ্বাস করতে চায় না যে মানিব্যাগ হারিয়েছে। তারা খুব যন্ত্রণা করে। ইলা নিজে একবার এ রকম যন্ত্রণার মধ্যে পড়েছিল। যাত্রাবাড়ি থেকে বার টাকা রিকশা ভাড়া ঠিক করে সে আর রুবা এসেছে বায়তুল মুকাররমে। কিছু কেনার নেই — এম্নি ঘুরার জন্যে আসা। রিকশা থেকে নেমে ব্যাগ খুলে দেখে পুরানো ছেঁড়াখোঁড়া একটা এক টাকার নোট ছাড়া কোন টাকা নেই। কি বিশ্রী কাণ্ড! রিকশাওয়ালার সরল সরল মুখ, কিন্তু সে এমন হৈচৈ শুরু করল যে তাদের চারদিকে লোক জমে গেল। লোকগুলি ভাবল, ইচ্ছা করেই ইলা রিকশাওয়ালাকে টাকা দিচ্ছে



না। রুবা অসম্ভব ভীতু। সে ইলার বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল — এখন কি হবে আপা? এখন কি হবে? ইলা রিকশাওয়ালাকে বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে যাত্রাবাড়ি চলুন। আপনাকে চব্বিশ টাকা দেব। রিকশাওয়ালা থু করে থুথু ফেলে বলল, যাত্রাবাড়ি যামু ক্যান? আমার কি ঠেকা?

'আপনার কোন ঠেকা না, আমাদের ঠেকা। প্লীজ চলুন।'

ইলার আবেদনে কোন লাভ হল না বরং রিকশাওয়ালাটা আরো প্রশ্রয় পেয়ে গেল। সে আরো কিছু রিকশাওয়ালা জুটিয়ে ফেলল এবং সরল সরল মুখ করে মিথ্যা কথা বলা শুরু করল — এই মাইয়া দুইটা আমারে ভাড়া দেয় না। আবার উল্টা গালি দিতাছে। আমারে বলে তুই ছোডলোকের বাচ্চা।

রুবা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আপা ব্যাগে তোমার যে কলমটা আছে ঐ কলমটা ওকে দিয়ে দাও। কলম নিয়ে চলে যাক।

'কলম দিয়া আমি করমু কি? কলম ধুইয়া খামু? কলম খাইলে ফেড ভরব?'

আর ঠিক তখন মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক এসে গম্ভীর গলায় বললেন — কত হয়েছে ভাড়া?

রুবা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বার টাকা।

ভদ্রলোক একটা বিশ টাকার নোট বাড়িয়ে বললেন, এটা রাখ। সঙ্গে কলম আছে? আমার ঠিকানা লিখে রাখ। এক সময় ফেরত দিয়ে যেও।

তাদের চারপাশের ভিড় তবুও কমে না। যেন নাটকের শেষ দৃশ্যটি এখনো বাকি আছে। এরা শেষটা না দেখে যাবে না। ইলা ঠিকানা লিখছে — ভদ্রলোক বলছেন — লেখ বি. করিম। এগার বাই এফ, কলতাবাজার। দোতলা।

ভিড়ের মধ্যে একজন বলল, টাকা ফেরত দিতে হবে না। টাকার বদলে অন্য কিছু দিলে আরো ভাল হয়।

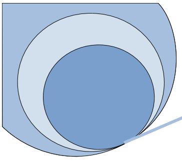
একসঙ্গে সবাই হেসে উঠল। রুবার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। একজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আবার দেহি কান্দে!'

আবারো সবাই হেসে উঠল। সময় সময় কোন কারণ ছাড়াই মানুষ খুব নির্মম হয়। মধ্যবয়স্ক ঐ ভদ্রলোক চলে গেলেন না। ভিড় থেকে তাদের বের করে আনলেন। রুবার দিকে তাকিয়ে বললেন — নাম কি?

'রুবা। দিলরুবা খানম।'

'শোন দিলরুবা খানম — কাঁদছ কেন? কাঁদার মত ঘটনা কি ঘটল? টাকা-পয়সা সঙ্গে না নিয়ে বাড়ি থেকে বের হও কেন? যাও, বাড়ি যাও।'

ভদ্রলোক লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। একবার পেছনে ফিরে



তাকালেনও না। মোটা মোটা ভারিক্কি ধরনের এই মানুষটাকে ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয়া হল না।

হাসান নিঃশব্দে এসে পর্দার ওপাশে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে নিজের পায়ের নখের দিকে। গভীর মনোযোগে নখের শোভা দেখছে হয়ত। ইলা নিজ থেকে কিছু না বললে সে চুপ করেই থাকবে। কিছুই বলবে না। অদ্ভুত ছেলে!

'হাসান, তুমি অন্তুকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে? দেখ না ওর ঠোঁটের অবস্থা।'

হাসান এক পলকের জন্যে তাকাল। তার কোন ভাবান্তর হল না। তবে সে কথা বলল। মেঝের দিকে তাকিয়েই বলল, ভাবী, মনে হচ্ছে সেলাই লাগবে। আর এটিএস দিবে। কিছু হলেই ওরা এটিএস দেয়।

'দাঁড়াও, তোমাকে টাকা দিয়ে দি। কত লাগবে বল তো?'

'বুঝতে পারছি না ভাবী, গোটা ত্রিশেক দিন।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, ভাংতি টাকা ঘরে নেই। কি করা যায়! ভাংতি কেন, কোন টাকাই নেই। জামানের মানিব্যাগ থেকে একটা পাঁচশ' টাকার নোট কি দিয়ে দেবে? জামান জানতে পারলে খুব রাগ করবে। আর জানতে যে পারবে তাও নিশ্চিত। টাকা না গুনেই সে বলে দিতে পারবে — পাঁচশ' টাকার একটা নোট কম।

ইলা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, একটা পাঁচশ' টাকার নোট দেব?

'দিন। আমি ভাঙিয়ে নেব।'

'তুমি মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছ কেন হাসান?'

হাসান জবাব দিল না। চোখ তুলে তাকালও না। ইলা তাকে পাঁচশ' টাকার একটা নোট দিল। অন্তু ছোট ছোট পা ফেলে যাচ্ছে। অন্তুর পা দুটি শরীরের তুলনায় ছোট। কেমন হেলেদুলে হাঁটে, মনে হয় পড়ে যাবে।

পাঁচশ' টাকার নোট মোট কতগুলি আছে? ইলার গুনে দেখতে ইচ্ছা করছে। টাকা দেখলেই সব মানুষেরই বোধহয় গুনতে ইচ্ছা করে। ইলার যা ভাগ্য, গুনবার সময়ই হয়ত জামান এসে উপস্থিত হবে। থাক, গোনার দরকার নেই। আন্দাজে মনে হচ্ছে একশ'টার মত হবে। তার মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কি সর্বনাশ! গা ঝিম-ঝিম করে। এতগুলি টাকা একটা মানুষ পকেটে নিয়ে ঘুরে? যদি সত্যি সত্যি হারিয়ে যেত। ইলা টাকা গুনতে বসল। একশ' বারটা পাঁচশ' টাকার নোট। তার মানে ছাপ্পান্ন হাজার। কি সর্বনাশ!

ইলা দরজা বন্ধ করে আলনার দিকে গেল। ঘরে পরার একটা শাড়ি নেবে।

বাথরুমে গিয়ে গা ধুবে। প্রচণ্ড গরম লাগছে। গা কুটকুট করছে। বাথরুমে গিয়ে হয়ত দেখা যাবে পানি নেই। বিকেলের দিকে এ বাড়িতে পানি থাকে না। জামানকে একটা বড় বালতি কিনতে বলেছিল। জামান বিরক্ত হয়ে বলেছে — খামোকা একটা বড় বালতি কেনার দরকার কি? দু'জন মাত্র মানুষ — বালতি-ফালতি কিনে বাড়ি ভর্তি করার জাস্টিফিকেশন নেই। শুধু ঝামেলা। কি কিনতে হবে, কি কিনতে হবে না — তা আমাকে বলার দরকারও নেই। আমার চোখ-কান খোলা, আমি জানি কি দরকার — কি দরকার না। যখন যা দরকার হবে, আমি ঠিকই কিনব।

কি অদ্ভুত মানুষ! টাকা আছে, অথচ খরচ করবে না। বিয়ের প্রথম এক মাস ইলা কিছু বুঝতে পারে নি। সে ভেবেছিল, মানুষটার আর্থিক অবস্থা বোধহয় তাদের মতই। টাকা-পয়সা নেই। যদিও থাকছে সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে। বসার ঘরে কার্পেট আছে, সোফা আছে, টিভি, ফ্রীজ আছে। তবে হাতে হয়ত নগদ টাকা নেই। বিয়ে উপলক্ষে জিনিসপত্র কিনেই সব শেষ করে ফেলেছে। লোকটার উপর খুব মায়া হয়েছিল। মায়া হয়েছিল বলেই বিয়ের তিন দিনের দিন সে বলেছিল — আমার কাছে সাতশ' টাকা আছে। তোমার যদি দরকার হয় তুমি নিতে পার।

'কোথায় পেলে সাতশ' টাকা?'

'ভাইয়া আমাকে এক হাজার টাকা দিয়েছিল। বিয়েতে কিছু দিতে পারে নি এই জন্যে এক হাজার টাকা দিল। আমি নিতে চাই নি . . .'

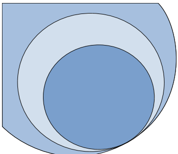
'এক হাজার থেকে সাতশ' আছে, বাকি তিনশ' কি করলে?'

ইলা বিস্মিত হয়ে বলল, খরচ করেছি।

'গরীব ঘরের মেয়ে। খরচের এই হাত তো ভাল না। দেখি, এই সাতশ' টাকা আমাকে দিয়ে দাও। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে বলবে। একটা কথা মন দিয়ে শোন — ইলা এই জীবনে অনেক কিছুই কিনতে ইচ্ছা করবে। কিনতে ইচ্ছা করলেই কিনতে নেই। টাকা-পয়সা অনেকেরই থাকে — খুব কম মানুষই থাকে যারা টাকা জমাতে পারে। হাতের ফাঁক দিয়ে টাকা বের হয়ে যায়। বুঝতে পারে না। বুঝতে পারছ?

ইলা শুকনো গলায় বলল, পারছি। তার মনটা বেশ খারাপ হল। মানুষটা তাহলে কৃপণ। বেশ ভাল কৃপণ। ইলা লক্ষ্য করল মানুষটা শুধু কৃপণ না, মনও ছোট। কৃপণ মানুষের মন এম্নিতেই ছোট থাকে — তবে তারা তা গোপন রাখতে চেষ্টা করে। এই লোকটা তা করে না। বরং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

বিয়ের পরপর রুবা এসেছে, বড় বোনের সঙ্গে কয়েকদিন থাকবে। জামান হাসিমুখে গল্পটল্প করছে, তবু এক ধরনের গম্ভীর গম্ভীর ভাব। সারাক্ষণ ভুরু



কুঁচকানো। জামান এমন করছে কেন ইলা কিছুতেই ধরতে পারে না। তৃতীয় দিনের দিন রাতে ঘুমুতে যাবার সময় জামান হাই তুলতে তুলতে বলল, রুবা ক'দিন থাকবে?

ইলা হাসিমুখে বলল, এস. এস. সি. পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন তো ছুটি। চলে যেতে চেয়েছিল, আমি জোর করে রেখে দিয়েছি।

জামান গম্ভীর গলায় বলল, জোর করে রাখার দরকার কি? জোর জবরদস্তি ভাল না। হয়ত এখানে থাকতে ভাল লাগছে না।

'ভাল লাগছে না কে বলল। ভাল লাগছে — দেখ না কত হাসিখুশি।'

'সারাক্ষণ দেখি টিভির নব টেপাটেপি করছে। এইসব সেনসিটিভ ইনস্ট্রুমেন্ট। হুট করে নষ্ট করে দেবে।'

ইলা হতভম্ব হয়ে গেল। কি বলছে এই মানুষটা? জামান সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'ঐ দিন দেখি ফ্রীজের দরজা ধড়াম করে বন্ধ করল। ট্রাকের দরজাও এমন করে কেউ বন্ধ করে না। ফ্রীজের দরজা নিয়ে ফুর্তি করার দরকার কি?'

ইলা বলল, আচ্ছা, কাল সকালে ওকে যাত্রাবাড়িতে রেখে এস।

'সকালে পারব না, কাজ আছে। দেখি বিকেলে না হয় রেখে আসব।'

'না সকালেই রেখে আস।'

'রাগ করছ না-কি? ফালতু ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে রাগারাগি করবে না। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বেশি মাখামাখি কচলাকচলি আমার পছন্দ না। তারা থাকবে তাদের মত। আমরা থাকব আমাদের মত। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'বিয়ের পর সুখী হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাপের বাড়ি দ্রুত ভুলে যাওয়া। ভুলে যাবার চেষ্টা কর।'

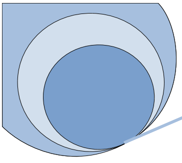
'চেষ্টা করব।'

জামান সত্যি সত্যি সকালে রুবাকে নিয়ে যেতে চাইবে, ইলা ভাবে নি। জামান তাই করল। ইলার চেয়েও অবাক হল রুবা। রুবা বলল, দুলাভাই, আমার তো আরো তিনদিন থাকার কথা। আজ যাব কেন?

'থাকতে চাইলে তিনদিন থাক, অসুবিধা কি! তোমার আপা বলল রেখে আসতে।'

রুবা গেল ইলার কাছে। বিস্মিত হয়ে বলল, দুলাভাই আমাকে যাত্রাবাড়িতে রেখে আসতে চাচ্ছে — ব্যাপার কি?

'ব্যাপার কিছু না।'



'তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে?'

'না।'

'এমন গম্ভীর মুখে না বলছ কেন? আচ্ছা শোন, মা যদি শুনে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে — মা খুব মন খারাপ করবে।'

'আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া হয় নি। আমার প্রচণ্ড মাথাধরা। এই জন্যেই বোধহয় গম্ভীর হয়ে আছি। তোর থাকতে ইচ্ছা হলে থাক।'

'না আপা, এখন যাই। দুলাভাই বলছিলেন তিনি ভিসিআর কিনবেন। কেনা হোক, তখন এসে অনেকদিন থাকব। রোজ পাঁচটা করে ছবি দেখব। তোমরা টেলিফান কবে নিবে আপা? এত সুন্দর বাড়ি — টেলিফোন ছাড়া মানায় না।'

'টেলিফোনের জন্যে অ্যাপ্লাই করেছে। এসে যাবে শিগগির।'

'দুলাভাইয়ের কি অনেক টাকা আপা?'

'জানি না।'

ইলা আসলেই জানে না। মানুষটা সম্পর্কে জানে না। তবু তার সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জীবন যাপন করে।

অন্তুর পেছনে মাত্র উনিশ টাকা খরচ হয়েছে। হাসান বাসে করে তাকে মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেছে। ডাক্তার দু'টা স্টিচ দিয়েছেন। এটিএস এবং কমবায়োটিক ইনজেকশন শুধু কিনতে হয়েছে। হাসান পাঁচশ' টাকার নোটটা ভাঙায়নি। ফেরত এনেছে। ইলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মানিব্যাগে রেখে দিলেই হবে। জামান কিছুই জানতে পারবে না।

'তোমাকে আমি সকালে টাকাটা দিয়ে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বস একটু, চা খাও।'

'আমি চা খাই না।'

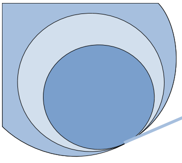
'চা না খেলে শরবত খাও। আমি লেবু দিয়ে শরবত বানিয়ে দি। ভাল লাগবে।'

'কিছু লাগবে না ভাবী।'

'তুমি বস তো দেখি।'

হাসান জড়সড় হয়ে সোফার চেয়ারে বসল। এখনো মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। কার্পেটের ডিজাইন দেখছে। পুরুষ মানুষ এমন হয় কখনো? কি বিশ্রী মেয়েলী স্বভাব!

'কি পড় তুমি?'



'বি. এ. পড়ি। এ বছর পরীক্ষা দেব।'

'তাই নাকি? কখন পড়? আমি তো সব সময় তোমাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখি।'

'নাইট সেকশনে পড়ি। জগন্নাথ কলেজে।'

'ও আচ্ছা।'

'ডে সেকশনে ভর্তি হতাম। চান্স পেয়েছিলাম। চাচা নিষেধ করলেন। চাচা বললেন — দিনে অনেক কাজকর্ম আছে। তাই . . . '

'চাচা কে? আমাদের বাড়িওয়ালা?'

'জ্বি।'

'আমি শুনেছিলাম তিনি তোমার মামা।'

'জ্বি–না, চাচা। বাবার ফুপাতো ভাই।'

'দিনের বেলায় কি কাজ কর?'

'বাজার করি। তারপর প্রেসে যাই। চাচার একটা প্রেস আছে মগবাজারে। কম্পোজ সেকশান।'

'ও, তাই নাকি?'

'জ্বি।'

'তুমি আমার অনেক উপকার করলে ভাই, নাও, শরবত খাও। ঘরে আর কিছু নেই।'

হাসান এক নিঃশ্বাসে শরবতের গ্লাস শেষ করেই উঠে দাঁড়াল। ইলার মনে হল শরবতের বদলে চা দিলে গরম চা–ও হয়ত সে এভাবে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলত।

'ভাবী যাই?'

'তুমি আরেকদিন এসে আমাদের সঙ্গে চারটা ডাল–ভাত খাবে। আর শোন, তুমি আমাকে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? মুখ তুলে তাকাও। রাস্তায় কখনো দেখা হলে আমি তোমাকে চিনতে পারব না। এখনো আমি ভালমত তোমার মুখ দেখি নি।'

হাসান মুখ তুলে তাকাল। এই প্রথম সে হাসল। লাজুক ধরনের সুন্দর একটা ছেলে। কচি মুখ। সে আবার বলল, ভাবী যাই?

'আচ্ছা যাও। আর শোন, তুমি আমাকে ভাবী ডাকবে না। আপা ডাকবে। ভাবী ডাকটা শুনতে ভাল লাগে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আজ রাতে গেটটা একটু খোলা রাখতে হবে। ওর ফিরতে দেরি হবে। এগারটা বারটা বেজে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

অন্তুর জ্বর এসেছে। বেশ ভাল জ্বর। রাতে সে কিছুই খেল না। ইলা বসার ঘরে মাদুর পেতে অন্তুকে শুইয়ে দিল। বেচারা মরার মত শুয়ে আছে। গালে মশা বসেছে, সেই মশা তাড়াবারও চেষ্টা করছে না। ছেলেটার জন্যে একটা মশারি কিনতে হবে। জামানকে বলে দেখলে হয়। রাজি হতেও তো পারে। মশারি কোন অপ্রয়োজনীয় জিনিস নয়। প্রয়োজনের জিনিস।

ইলা অন্তুর হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট দিল। সে টাকা পেয়ে খুব খুশি। হাসার চেষ্টা করছে। ইলা বলল, খবর্দার, হাসবি না। হাসলে ঠোঁটে টান পড়বে। ব্যথা পাবি।

অন্তু ব্যথা পাচ্ছে। তবু হাসছে। এরা কত অল্পতে খুশি! ঠোঁটের ব্যথার কথা এখন আর তার মনে নেই। মনে থাকলেও ব্যথা অগ্রাহ্য করে সে ঘুমুবে। ভোরবেলা ওঠে কাজকর্ম করবে। টাকাটা লুকানো থাকবে গোপন কোন জায়গায়। বারবার কাজ ফেলে দেখে আসবে নোটটা ঠিকমত আছে কি-না।

'অন্তু! দুধ খাবি? এক কাপ দুধ এনে দেই?'

'দুধ গন্ধ করে।'

'থাক তাহলে। গন্ধ করলে খেতে হবে না। ঘুমিয়ে পড়।'

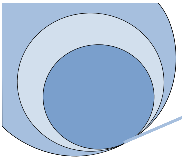
বাধ্য ছেলের মত অন্তু চোখ বন্ধ করল। ঘুমিয়েও পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

ছেলেটার বাবা-মা কোথায় আছে ইলা জানে না। অন্তু নিজেও জানে না। জানলে খবর দিত।

জামান রাত এগারটায় ফিরল। কোন কথা না বলে গম্ভীর মুখে তোয়ালে হাতে বাথরুমে ঢুকল। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, খেয়ে এসেছি। এক কাপ চা করে দাও।

আশ্চর্যের ব্যাপার! হারানো মানিব্যাগের কথা সে কিছুই বলছে না। ইলা ভেবেছিল ঘরে ঢুকে সে জিজ্ঞেস করবে, মানিব্যাগ পেয়েছ? এতগুলি টাকা মানিব্যাগে। জিজ্ঞেস করাই তো স্বাভাবিক। যে কোন মানুষ করবে। জামানের মত সাবধানী মানুষ আরো বেশি করবে। জিজ্ঞেস করছে না কেন?

খালি গায়ে বারান্দায় বসে জামান চা খাচ্ছে। বারান্দায় বাতি নেভানো। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবু সে যে খুব চিন্তিত, এটা বোঝা যাচ্ছে। কেমন কুঁজো হয়ে বসেছে। একটু পরপর শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলছে। ইলা ঠিক করল, রাতে শোবার



সময় সে বলবে মানিব্যাগ ঘরে পাওয়া গেছে। তুমি ফেলে গিয়েছিলে। এত চিন্তা করার কিছু নেই।

ইলা চায়ের কাপ জামানের দিকে বাড়িয়ে ধরল। জামান শান্ত গলায় বলল, বিরাট একটা লোকসান হয়েছে।

'কি লোকসান?'

'পকেট মার হয়েছে।'

'বল কি?'

'হারামজাদা মানিব্যাগ নিয়ে গেছে।'

'সত্যি নিয়েছে?'

'এটা আবার কি রকম কথা? সত্যি না তো কি? আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা-ফাজলেমি করছি?'

ইলা কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। জামান চায়ের কাপ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিজের মনেই বলল, কোত্থেকে নিয়েছে তাও জানি। কলাবাগানে রিক্সা থেকে নামলাম। ঠিক তখন একটা লোক ঘাড়ে পড়ে গেল। মানিব্যাগ যে তখনি পাচার হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারি নি। রিকশা ভাড়া দিতে গিয়ে বুঝলাম। এর মধ্যে হারামজাদা হাওয়া।

'মানিব্যাগ পকেটে ছিল?'

'মানিব্যাগ পকেটে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? অনাবশ্যক কথা বল কেন? কি বিশ্রী অভ্যাস।'

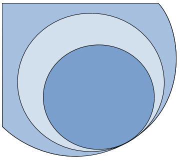
'কত টাকা ছিল?'

'ছিল কিছু। ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও, আর পান দাও। দেশটা চোরে ভর্তি হয়ে গেছে।'

জামান ঘুমুতে এল খবরের কাগজ হাতে। বিছানায় বসে মানুষটা ভুরু কুঁচকে কাগজ পড়ছে। ইলা বুঝতে পারছে জামান আসলে কাগজ পড়ছে না। নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে। ইলা শুয়ে আছে। তাকিয়ে আছে জামানের দিকে। বড় মায়া লাগছে।

ইলার ঠিক মাথার নিচেই প্রায় একশ' বারটা পাঁচশ' টাকার নোট বোঝাই মানিব্যাগ। না একশ' বার না, তের। হাসানের ফেরত দেয়া নোটটাও সে রেখে দিয়েছে। সে এক সময় ক্ষীণ স্বরে বলল, এই, একটা কথা শোন।

জামান বিরক্ত স্বরে বলল, এখন ঘুমাও তো। কোন কথা শুনতে পারব না। কথাবার্তা যা সকালে বলব। দুপুর রাতের জন্যে জমা করে রাখবে না।



'ঘুমুবে না?'

'কেন যন্ত্রণা করছ? তোমার ঘুম তুমি ঘুমাও।'

'টাকা হারানোয় খুব খারাপ লাগছে?'

'না, খারাপ লাগছে না। খুব আনন্দ পাচ্ছি।'

জামান খবরের কাগজ ভাঁজ করে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল। এটি তার স্বভাবের বাইরে। সে খুব গোছালো। এমন কাজ কখনো করবে না। ইলা বলল, বাতি নিভিয়ে দেব?

'দাও।'

ইলা বাতি নিভিয়ে দিল। অন্তু মিয়া কুঁ-কুঁ শব্দ করছে, জ্বর বোধহয় আরো বেড়েছে। জ্বর বাড়লে কি করতে হবে ডাক্তার কি তা বলেছে? ঘরে একটা থার্মোমিটার নেই। তাদের যাত্রাবাড়ির বাসায় থার্মোমিটার আছে। রুবার দখলে থাকে। রুবার একটা কাঠের বাক্স আছে। সেই বাক্সে শুধু যে থার্মোমিটার আছে তাই না — ডেটল আছে, তুলা আছে, বার্নল আছে। বাক্সের গায়ে বড় বড় করে লেখা — 'আরোগ্য নিকেতন'।

ইলা ক্ষীণ গলায় বলল, ঘুমুচ্ছ?

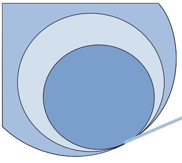
জামান জবাব দিল না। তবে সে যে এখনো ঘুমায় নি তা বোঝা যাচ্ছে।

ইলা আর কিছু বলল না। তার ঘুম আসছে না। প্রায়ই তার এরকম হয়। জেগে জেগে রাত পার করে দেয়। নানান কথা ভাবে। রাত জেগে ভাবতে তার বড় ভাল লাগে।

জামান বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। ইলা খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামল। ফ্যানের নিচেও খুব গরম লাগছে। বারান্দায় এসে সে কিছুক্ষণ বসবে। এটাও নতুন কিছু নয়। প্রায়ই বসে। অন্ধকারে একা একা বসে থাকার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে।

ইলা বারান্দায় চেয়ারে বসতে বসতে ভাবল, মানিব্যাগটা ফিরিয়ে না দিলে কেমন হয়? সে নিজে বুঝতে পারছে, এটা খুবই অন্যায় চিন্তা। কিন্তু কিছুতেই মাথা থেকে দূর করতে পারছে না। এক বান্ডিল 'পাঁচশ' টাকার নোট। এত টাকা এক সঙ্গে সে নিজে কখনো দেখে নি। টাকাটা কি সে নিজের জন্যে রেখে দিতে পারে না? যদি রাখে তাহলে কি খুব বড় পাপ হবে?

অন্তু আহ্-উহ্ করছে। ইলা উঠে গিয়ে তার কপালে হাত রাখল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথায় পানি ঢালা দরকার। এত রাতে পানি ঢালাঢালির ব্যবস্থা করলে



জামানের ঘুম ভেঙে যাবে। সে খুব বিরক্ত হবে। ইলা অসহায় ভঙ্গিতে অন্তুর মাথার পাশে বসে রইল।

তার নিজের পানির পিপাসা হচ্ছে, কিন্তু উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না । একজন কেউ যদি হাতের কাছে থাকত এবং বলা মাত্র গ্লাস ভর্তি বরফ শীতল পানি নিয়ে আসত তাহলে চমৎকার হত।

'অন্তু।'

'উঁ।'

'তোর অসুখ সারলে তোকে আমি মা'র বাসায় রেখে আসব। সেখানে খুব আরামে থাকবি।'

'আচ্ছা।'

'এ বাড়িতে তোর কি ভয় লাগে?'

'হুঁ।'

ইলা মনে মনে বলল, আমারো ভয় লাগে । পানির পিপাসা ক্রমেই বাড়ছে। উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না। এখন যদি জামান ঘুমের ঘোরে বলে, পানি দাও। সে পানি নিয়ে আসবে। অন্তু চাইলেও আনবে। অথচ নিজের জন্যে পানি আনতে যাবার সামান্য কষ্টটাও করবে না।

২

রুবা আটটার আগে ঘুম থেকে উঠে না। যত সকাল সকালই ঘুমুতে যাক, উঠতে উঠতে সেই আটটা। তাও নিজ থেকে উঠবে না, কাউকে এসে ডাকতে হবে, পা ধরে ঝাঁকুনি দিতে হবে। ইদানিং ঘুম ভেঙে প্রথম যে কথাটি সে বলছে তা হচ্ছে — আজ কলেজে যাব না, মা। শরীর ভাল না।

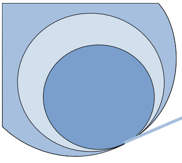
রুবার কথা শুনে তাঁর মা সুরমা এমন ভঙ্গিতে তাকাবেন যাতে মনে হবে তিনি এই মুহূর্তে মেয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। রুবা তখন বলবে — ঠিক আছে মা, যাচ্ছি। যদিও যাবার কোন রকম তাড়া দেখা যাবে না। দীর্ঘ সময় নিয়ে দাঁত মাজবে। নাশতা খেতে দেরি করবে। কাপড় পরতে দেরি করবে ; তারপর রিকশা ভাড়ার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকবে। যদিও সে জানে রিকশা ভাড়া পাওয়া যাবে না। যেতে হবে বাসে। সময় নষ্ট করবার জন্যেই রিকশা ভাড়া নিয়ে হৈচৈ করা। শুরুর একটা বা দুটা পিরিয়ড রুবা কখনো ধরতে পারে না। এই নিয়ে তার খুব মাথাব্যথাও নেই। বন্ধু ঠিক করা আছে যার প্রক্সি দেবে। রুবার বন্ধুর ভাগ্য খুব ভাল। কলেজ চলাকালীন সময়ে তাকে দেখা যাবে ক্যান্টিনে আড্ডা দিতে। মজার মজার গল্প বলে বান্ধবীদের সে সারাক্ষণ হাসাতে পারে। কলেজের প্রতিটি আপার কথা বলা এবং হাঁটা নকল করতে পারে। রুবার এই প্রতিভা কলেজের আপাদের অজানা নয়। প্রিন্সিপ্যাল আপা একদিন তাকে ডেকে নিয়ে খুব ধমকালেন। কড়া গলায় বললেন, আবার যদি শুনি তুমি আপাদের নকল করছ তাহলে খুব খারাপ হবে। কলেজ থেকে বের করে দেব। কলেজ পড়াশোনার জায়গা, এটা নাট্যশালা নয়।

রুবা মাথা নিচু করে বলেছে, আর করব না আপা। তখন রুবাকে অবাক করে দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল আপা বললেন — মিস মনোয়ারা কিভাবে হাঁটেন একটু দেখি।

'সত্যি দেখাব?'

'হ্যাঁ, দেখাও। এটা হচ্ছে তোমার লাস্ট পারফরম্যান্স। মাইন্ড ইট। কলেজের ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে আমি খুবই কড়া।'

রুবা মনোয়ারা আপার কোমর দুলিয়ে হাঁটা এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ার ভঙ্গির খানিকটা করল। প্রিন্সিপ্যাল আপা খুব চেষ্টা করলেন না হাসতে। শেষ পর্যন্ত পারলেন না। হাসলেন, কাশলেন এবং বিষম খেলেন। প্রিন্সিপ্যাল আপা বুঝতেও পারলেন না তাঁর একই সঙ্গে হাসি, কাশি ও বিষম খাওয়ার দৃশ্যটি রুবা দশ মিনিটের



ভেতরেই কমনরুমে দেখাবে এবং দৃশ্য দেখে তার বান্ধবীরা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাবে।

রুবা এ রকম ছিল না। তার পরিবর্তনটা হয়েছে হঠাৎ। কলেজে ঢোকার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রুবা বদলে গেছে। আগে যে কোন তুচ্ছ কারণেও তার চোখে পানি এসে যেত। এখন হাসি এসে যায়। সে এরকম হল কেন সে নিজেও জানে না।

আজ রুবার ঘুম ভেঙেছে খুব ভোরে। বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করেছে। আপার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় এই একটা লাভ তার হয়েছে। পুরোপুরি বিছানার দখল পাওয়া গেছে। এই গরমে কারো সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে শুতে হচ্ছে না। ঘুমের ঘোরে কেউ গায়ে পা তুলে দিচ্ছে না। পুরো রাজত্ব তার একার।

সুরমা যথানিয়মে তাকে ডাকতে এলেন। রুবা বলল, পা ধরে ঝাঁকুনি শুরু করবে না মা, আমি জেগে আছি।

'উঠে আয়। হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হ।'

'আজ কলেজে যাব না মা। এরকম কড়া করে তাকালেও কোন লাভ হবে না। হাতি দিয়ে টেনেও কেউ আজ আমাকে কলেজে নিতে পারবে না।'

'কেন ?'

'আজ কলেজে গেলেই দেড়শ' টাকা দিতে হবে। দেড়শ' টাকা তুমি দিতে পারবে না। আমারও যাওয়া হবে না।'

'এখন কিসের দেড়শ' টাকা ! সেদিন না বেতন দিলি ?'

'পিকনিক হচ্ছে মা।'

'চৈত্র মাসে কিসের পিকনিক ?'

'পিকনিকের কোন চৈত্র-বৈশাখ নেই। যখন ইচ্ছা তখন করা যায়। আমাদের কলেজের কিছু বড়লোকের মেয়ে পিকনিক করছে চৈত্র মাসে। তারা একটা লঞ্চ ভাড়া করেছে। ঐ লঞ্চ ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ যাবে। আবার ফিরে আসবে। এর জন্যে চাঁদা হচ্ছে দেড়শ' টাকা।'

'তুই ওদের সঙ্গে যাবি কেন ?'

'যাব নাইবা কেন ?'

'বড়লোকের মেয়েদের সঙ্গে তোর এত কিসের মাখামাখি ? তুই তোর নিজের

মত মেয়েগুলির সঙ্গে মিশবি।'

'গরীব মেয়েগুলিকে খুঁজে বের করব? জনে জনে জিজ্ঞেস করব — তুমি কি গরীব, তোমার বাবা কি মারা গেছেন? তোমার বড় ভাই কি খুব কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছেন? তুমি কি রোজ বাসে করে স্কুলে আস? পিকনিকে যাবার জন্যে সামান্য দেড়শ' টাকা চাঁদা কি তুমি দিতে পার না? যদি না পার তাহলে আস, তুমি আমার বন্ধু।'

'চুপ কর তো রুবা। তুই এমন ফাজিল হচ্ছিস কিভাবে?'

'জানি না মা কিভাবে হচ্ছি। আমার ফাজলামি দেখে তুমি যেমন অবাক হচ্ছ আমি নিজে তার চেয়েও বেশি অবাক হচ্ছি। মনে হয় আমাকে জ্বীনে ধরেছে। সুন্দরী মেয়েদের জ্বীনে ধরে।'

'চুপ করবি?'

'আমাকে ধমক দিয়ে কোন লাভ হবে না মা। যে জ্বীনটা আমাকে ধরেছে তাকে কড়া করে ধমক দিতে হবে। তাকে বলতে হবে — হে জ্বীন, তুমি আমার শান্ত ভালমানুষ মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে বড়লোকের কোন মেয়েকে ধর।'

সুরমার কড়া দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রুবা হাই তুলল। আদুরে গলায় বলল, এখন ক'টা বাজে বলতে পারবে? সুরমা মেয়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বের হয়ে এলেন। রুবা বিছানা ছাড়ল। বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বারান্দায় রুবার বড় ভাই বাবু তার দিনের সবচে' কঠিন কাজটি করছে। শুধুমাত্র একটা ব্লেড হাতে নিয়ে দাড়ি শেভ করার চেষ্টা করছে। সে বসেছে উবু হয়ে। তার সামনে চেয়ারের উপর ছোট্ট একটা আয়না। বাবুর সমস্ত চিন্তা-চেতনা আয়নায় নিবদ্ধ। রুবা বড় ভাইয়ের দাড়ি শেভ করার দৃশ্য শান্তমুখে খানিকক্ষণ দেখল। এই দৃশ্য তার কখনো ভাল লাগে না, গা শিরশির করে। একটা সামান্য রেজার কিনতে কত টাকা লাগে? ভাইয়া তা কিনবে না। নিজের জন্যে একটা পয়সা খরচ করতেও তার গায়ে জ্বর আসে।

'ভাইয়া!'

'হুঁ।'

'আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ নাপিত ছিল। নাপিত ছাড়া শুধুমাত্র ব্লেড দিয়ে এত সুন্দর শেভ কেউ করতে পারবে না।'

বাবু হাসল। রুবা তার সামনে বসতে বসতে বলল, ভাইয়া, চৈত্র মাসের এই সুন্দর সকালে তোমার কাছে কি সামান্য একটা আবেদন রাখতে পারি?

'অবশ্যই পারিস।'

'তুমি কি আমাকে দেড়শ'টা টাকা দিতে পার?'

'দেড়শ'?'

'হ্যাঁ দেড়শ'। ভাইয়া দেবে?'

'হ্যাঁ দেব।'

রুবা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ভাইয়ার স্বভাবই হচ্ছে — সব কিছুতেই হ্যাঁ বলবে। আজ পর্যন্ত সে কখনো ভাইয়াকে 'না' বলতে শুনে নি। 'না' বলে যে বাংলা অভিধানে একটা শব্দ আছে তা বোধহয় এই চমৎকার মানুষটা জানে না।

'ভাইয়া, টাকাটা আজই দিতে হবে।'

বাবু আয়না থেকে মুখ ফেরাল। রুবার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত গলায় বলল, আজ তো দিতে পারব না রুবা। আজ হাত একেবারে খালি। একশ'টা টাকা আছে, বাজার খরচ। চাল কিনতে হবে। পাঁচ কেজি চাল কিনতেই সত্তুর টাকা চলে যাবে। তোরা তো আবার মোটা চাল খেতে পারিস না।

ভাইয়া এমনভাবে কথা বলছে যেন রুবা একটা বাচ্চা মেয়ে। সংসারের কোন সমস্যা সে বুঝতে পারে না। ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। সংসারের অনেক সমস্যা সে সবার আগে বুঝে। খুব ভালই বুঝে।

'রুবা।'

'কি ভাইয়া।'

'কিছু টাকা পাই এক জায়গায়। একটা বিল আটকে আছে। সপ্তাহখানিক পরে হলে তোর চলবে না?'

'হুঁ চলবে। খুব চলবে। তুমি বরং সপ্তাহখানেক পরে দিও।'

ভাইয়াকে খুশি করার জন্যে বলা। তার দরকার আজ। সপ্তাহখানিক পর সে টাকা দিয়ে কি করবে? পিকনিকের কথাটা যখন উঠল তখন যদি সে বলত— "ঝড়-বাদলের দিনে কিসের পিকনিক? আমি এর মধ্যে নেই।" তাহলে আজ আর এই ঝামেলা হত না। তখন সে-ই সবচে' বেশি লাফিয়েছে। কি কি খাওয়া হবে তার লিস্ট বানিয়েছে। সবাই শাড়ি পরে যাবে। হলুদ শাড়ি। এ রকম একটা প্রস্তাবও ছিল। সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে। বাতিল হয়েছে তার জন্যে। কারণ তার হলুদ শাড়ি নেই।

সুরমা লক্ষ্য করলেন, রুবা কলেজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কলেজে যাবার নাম করে অন্য কোথাও যাচ্ছে না তো? ইদানিং তার এ রকম সন্দেহ হচ্ছে। দিনকাল

ভাল না। ছেলেপুলেরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এদের রাখতে হয় চোখে চোখে। তার উপর বাপ নেই মেয়ে। গার্জেন ছাড়া মেয়ে হচ্ছে পাল-খাটানো নৌকার মত। যেদিকে বাতাস দিবে সেদিকে যাবে। আর বাবার সংসারের মেয়ে হল গুনটানা নৌকা। যে নৌকাকে বাবাই গুনের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাবে। তার সংসারে গুন টানার মানুষ নেই। বাবু সাধ্যমত করছে। করলেও সে হল ভাই। বাবার কাজ কি ভাই দিয়ে হয়?

'কোথায় যাচ্ছিস রুবা?'

'কোথায় আবার? কলেজে। রিকশা ভাড়া দাও মা।'

'রোজ রোজ রিকশা ভাড়া — কি শুরু করেছিস তুই?'

'আচ্ছা বেশ। না দিলে না দেবে। চেঁচিও না। সকাল বেলাতেই চেঁচামেচি শুনতে ভাল লাগে না।'

'সত্যি করে বল তো কোথায় যাচ্ছিস?'

'প্রথমে যাব আপার কাছে। দেড়শ' টাকা ধার চাইব। যদি পাই তাহলে যাব কলেজে, আর যদি না পাই তাহলে যাব সদরঘাট।'

'সদরঘাট?'

'হুঁ। সদরঘাট থেকে বুড়িগংগায় ঝাঁপ দেব। সলিল সমাধি।'

'তোর কথাবার্তার কোন মা-বাপ নেই।'

'না নেই। আমি ঠাট্টা করছি না মা। সত্যি সত্যি বুড়িগংগায় ঝাঁপ দেব। ঝপাং একটা শব্দ; তারপর সব শেষ। বুড়িগংগায় যে চীন মৈত্রী সেতু আছে — ঐ সেতু থেকে ঝাঁপ দেব।'

সুরমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এই মেয়ে কনট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। একে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেয়া দরকার। কোন সম্বন্ধ আসছে না। একটা ছেলে পাওয়া গেছে। কিন্তু তার কথা বলতেও সাহসে কুলুচ্ছে না। ছেলের আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। সেই পক্ষের একটা ছেলে আছে। তাতে তো আর জগৎ-সংসার অশুদ্ধ হয়ে যায় না। পাত্র হিসেবে বরং এইসব ছেলেই ভাল হয়। বাবুর সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে।

বাবু রুবার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। তাকে বাসে তুলে দিয়ে সে বাজার করবে। সেই বাজারে রান্না হবে। অতি দ্রুত খেয়ে ছুটবে অফিসে। অফিস হচ্ছে মালিবাগে তিনতলায় আট ফুট বাই ছ'ফুট একটা ঘর। ঘরের বাইরে সাইনবোর্ড — 'বন' এন্টারপ্রাইজ। বাবুর ব এবং নাসিমের ন দিয়ে 'বন'। দুই বন্ধুর পার্টনারশীপ

বিজনেস।

'আমাকে বাসে তুলে দিতে হবে না, ভাইয়া। তুমি তোমার কাজে যাও।'

'আহ্ চল না। গল্প করতে করতে যাই।'

'তুমি আবার গল্পও জান নাকি?'

'আমি জানি না। তুই তো জানিস। তুই বল আমি শুনি।'

'আমি যেসব গল্প জানি সেসব তোমার ভাল লাগবে না।'

'কি করে বুঝলি?'

'আমি বুঝতে পারি। আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি যা তোমরা বুঝতে পার না।'

বাসে উঠা খুবই মুশকিল। ভোরবেলা চাপের সময় কোন কন্‌ডাক্টার মহিলা যাত্রী নিতে চায় না। একজন মহিলা একাই পাঁচজনের জায়গা দখল করে। গায়ে গা লেগে গেলে ছ্যাঁৎ করে উঠে। কি দরকার ঝামেলার।

রুবা বলল, শেয়ারে টেম্পোতে করে চলে যাই, ভাইয়া? গুলিস্তানে নামব। এক টাকা মাত্র ভাড়া।

'আরে না, টেম্পোতে মেয়েরা যায় নাকি?'

'বাসে যেতে পারলে টেম্পোতেও যাওয়া যায়। অনেক মেয়েরা কিন্তু যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে নাকি?'

'হুঁ। আমি নিজেও দু'দিন গেলাম।'

'সে কি?'

'গুলিস্তানে নামলে আমার সুবিধাও হবে। প্রথমে যাব আপার কাছে।'

'ইলার কাছে গেলে বলিস তো খুব সাবধানে থাকতে। পত্রিকায় দেখলাম, ঝিকাতলার এক বাসায় দিনে-দুপুরে ডাকাতি হয়েছে। টিভি নিয়ে গেছে। খবরটা শুনেই বুকে ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভাবলাম ওর বাসাতেই ডাকাতি হল কি-না।'

'আপাদের পাশের বাসায় হয়েছে।'

'তুই জানলি কিভাবে?'

'আমার মন বলছে।'

রুবা হাসতে লাগল। বাবু তাকে টেম্পোতে তুলে দিল। অন্য যাত্রীরা সরু চোখে তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা তারা পছন্দ করছে না। টেম্পোর ছোকরা দাঁত বের করে হাসছে। নতুন ধরনের যাত্রী, তার মনে হয় ভালই লাগছে।

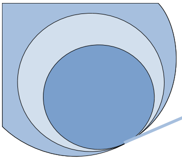
রুবার পাশে একটি অল্পবয়সী ছেলে। খুব সম্ভব মফস্বল থেকে এসেছে। সে

অস্বস্তি বোধ করছে। অনেকখানি জায়গা রুবাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে এমন করে গুটিয়েছে যে রুবার একটু মন খারাপ হল। সে নরম স্বরে বলল, আপনার এত কষ্ট করার দরকার নেই। আপনি আরাম করে বসুন। গায়ে গা লাগলে আমার গা পচে যাবে না।

'অসুবিধা নাই। আমার কোন অসুবিধা নাই।'

ছেলেটি আরো গুটিয়ে গেল। অস্বস্তিতে বেচারা যেন মারা যাচ্ছে। রুবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, জীবন গল্প-উপন্যাসের মত হলে বেশ হত। উপন্যাসে এই জায়গায় ছেলেটা কৃতজ্ঞ চোখে তাকাবে। ভাড়া দেবার সময় দেখা যায় ছেলেটা ম্যানিব্যাগ ফেলে এসেছে। মেয়েটা তখন ভাড়া দিয়ে দেবে। ছেলেটা বলবে, আপনাকে কি বলে যে থ্যাংকস্ জানাব। মেয়েটা বলবে, একদিন আসুন না আমাদের বাসায়। ছেলেটা আসবে। এসে দেখে কি অদ্ভুত কাণ্ড! চারতলা বিরাট এক বাড়ি। এই মেয়ে এই বাড়ির মেয়ে। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। ঐদিন মেয়েটি টেম্পোতে উঠেছিল নিতান্তই শখের কারণে। ছেলেটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে। কারণ সে খুব গরীব। টিউশ্যানি করে অনেক কষ্টে সংসার চালায়।

রুবাদের টেম্পোর পেছনে অনেকক্ষণ থেকে একটা লাল রঙের টয়োটা আসছে। হর্ন দিচ্ছে। সাইড পাচ্ছে না বলে যেতে পারছে না। টয়োটাটা চালাচ্ছে সুন্দরী একটা মেয়ে। সে কৌতূহলী চোখে মাঝে মাঝে রুবাকে দেখছে। এই মেয়েটি জীবনে হয়ত কোন দিন টেম্পোতে চড়ে নি। ভবিষ্যতেও চড়বে না। মাঝে মাঝে টেম্পোর মহিলা যাত্রীদের দিকে তাকাবে বিস্ময় নিয়ে। রুবার খুব ইচ্ছা করছে মেয়েটাকে একটা ভেংচি কাটতে। ভেংচি খেয়ে টয়োটা গাড়ির রূপবতী ড্রাইভারটির মুখের ভাব কেমন হয় দেখতে ইচ্ছা করছে। রুবা ভেংচি কাটার মানসিক প্রস্তুতি নেবার আগেই টয়োটাটা তাদের ওভারটেক করে গেল। রুবার মন খারাপ হয়ে গেল।



কে যেন নখ দিয়ে দরজা আঁচড়াচ্ছে।

কি অদ্ভুত কাণ্ড! কলিং বেল আছে, দরজার কড়া আছে। বেল টিপবে কিংবা কড়া নাড়বে। দরজা নখ দিয়ে আঁচড়াবে কেন? পাগল–টাগল না তো! ইলার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভাগ্যিস সে একা নেই। জামান আছে।

'কে?'

চাপা হাসির শব্দ। আবার দরজায় আঁচড়। ইলা সাহস করে দরজা খুলল। যা ভেবেছিল তাই। রুবা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

রুবা বলল, পাঁচ টাকা দিতে পারবে আপা? রিকশা ভাড়া।

'দাঁড়া দিচ্ছি।'

রুবা বসার ঘরে ঢুকে একটু হকচকিয়ে গেল। গম্ভীর মুখে জামান বসে আছে। জামানের সামনে সে কেন জানি সহজ হতে পারে না। রুবার ধারণা হল, দরজা আঁচড়ানোর ব্যাপারটায় দুলাভাই বিরক্ত হয়েছেন।

'কেমন আছেন দুলাভাই?'

'ভাল। দরজা আঁচড়াচ্ছিলে কেন?'

'ঠাট্টা করছিলাম।'

'এরকম ঠাট্টা না করাই ভাল। সব বয়সে সব ঠাট্টা ভাল না। আর শোন, রিকশা ভাড়া না নিয়ে রিকশায় উঠবে না। ধর, আমরা কেউ যদি বাসায় না থাকতাম তখন কি করতে?'

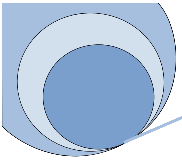
'এত ভোরে আপনারা যাবেন কোথায়? ঘরেই তো থাকবেন, তাই না? আমি আসছি দুলাভাই। ভাড়াটা দিয়ে আসি।'

রুবা একটু মন খারাপ করে রিকশা ভাড়া দিতে গেল। জামান ইলার দিকে তাকিয়ে অপ্রসন্ন গলায় বলল, তোমাদের সবারই কাণ্ডজ্ঞান একটু কম। একটু না, অনেকখানি কম। ইলা কিছু বলল না।

'পকেটে টাকা–পয়সা না নিয়েই রিকশা ভাড়া করে চলে এসেছে। এর মানে কি? এইসব ব্যাপার আমার খুব না–পছন্দ।'

'আস্তে বল, ও এসে শুনবে।'

'শোনার জন্যেই তো বলা। শুনে যদি কিছু শেখে। তা তো শিখবে না। সবাই



কাজ করবে তার নিজের মত।

রুবা বোধহয় কিছু শুনেছে। সে ঘরে ঢুকল মুখ কালো করে। লজ্জিত মুখে জামানের দিকে একবার তাকিয়েই নিচু গলায় বলল, আপা আরো দু'টাকা দিতে হবে। পাঁচ টাকা ভাড়া ঠিক করে এসেছি। এখন চাচ্ছে সাত টাকা। আমার কাছে একটা পাঁচ টাকার নোট আছে, ওটা নিতে চাচ্ছে না। একটু ছেঁড়া।

জামান বিশ্রী ভঙ্গিতে হাসল। লজ্জায় রুবার মরে যেতে ইচ্ছা করছে।

ইলা আরো দু'টাকা এনে দিল। জামান ঠাণ্ডা গলায় বলল, এরকম কাজ আর করবে না রুবা।

'জ্বি আচ্ছা।'

রুবার চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছিল। সে নিজেকে সামলে নিল। রিকশাওয়ালাকে বাড়তি দু'টাকা দিল। দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। এই মুহূর্তেই আবার ঘরে ঢোকা ঠিক হবে না। চোখে পানি এসে যাবে। বরং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নেয়া যাক। একবার ভাবল, ঘরে না গিয়ে কলেজের দিকে হাঁটা ধরবে। কিন্তু তাতে আপার মন খুব খারাপ হবে। ক্যাটক্যাট করে দুলাভাই নিশ্চয়ই আপাকে খুব কথা শুনাবে। রুবা আবার ঘরে ঢুকল।

জামান বলল, কোন কাজে এসেছ, না এম্নি?

'আপার কাছে এসেছিলাম।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। সেটা কাজে না অকাজে?'

'অকাজে।'

ইলা রুবার হাত ধরে তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। নিচু গলায় বলল, তোর দুলাভাইয়ের অনেকগুলি টাকা হারিয়ে গেছে। এই জন্যে মন খারাপ। যা মনে আসছে, বলছে। তুই কিছু মনে করিস না। লক্ষ্মী ময়না। কিছু মনে করবি না।

'না মনে করব কি? আমার এত মনটন নেই।'

'মা ভাল আছে?'

'আছে। মোটামুটি ভাল।'

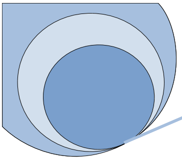
'আর ভাইয়া?'

'সেও ভাল।'

'তার ব্যবসা কেমন চলছে রে ?'

'ভাল না। লাভ এক পয়সাও হচ্ছে না। মাঝে মাঝে লোকসান। এখন মনে হচ্ছে সমান সমান যাচ্ছে। লাভও নেই, লোকসানও নেই।'

'নাসিম ভাই, নাসিম ভাই কেমন আছে?'



রুবা চট করে এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। আপার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, জানি না কেমন। অনেক দিন আমাদের বাসায় আসে না। ইলা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, তুই এইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? রুবা বলল, তোমাকে দেখছি। তুমি আরো সুন্দর হয়েছ। যত দিন যাচ্ছে তুমি তত সুন্দর হচ্ছ।

ইলা বলল, তুই দাঁড়া এখানে। আমি তোর দুলাভাইকে চা-টা দিয়ে আসি। তুই চা খাবি?

'না। আমাকে ফ্রীজের ঠাণ্ডা পানি দাও আপা। ফ্রীজ ধরলে দুলাভাই আবার রাগ করবে না তো?'

ইলা কিছু বলল না। চায়ের কাপ নিয়ে বসার ঘরে ঢুকল। জামান শার্ট গায়ে দিচ্ছে। আজ সে দাড়ি কামায়নি। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বিশ্রী লাগছে দেখতে। থুতনির কাছের কিছু দাড়ি পাকা। একদিন দাড়ি না কামালে তাকে কেমন বুড়োটে দেখায়। জামান চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, রুবা কি জন্যে এসেছে?

'এম্নি এসেছে। বেড়াতে। আবার কি জন্যে।'

'আমার তো মনে হয় টাকা-পয়সা চাইতে এসেছে। হাবভাবে তাই মনে হচ্ছে। পাঁচ দশ চাইলে দিয়ে দিও। এর বেশি চাইলে না করবে।'

'আচ্ছা।'

'আমি যাচ্ছি জয়দেবপুর। ফিরতে রাত দশটার বেশি বাজবে। বাড়িওয়ালাকে বলবে গেটটা যেন খোলা রাখে। ব্যাটা ছোটলোক! সন্ধ্যাবেলা গেট বন্ধ করে দিবে। ইয়ারকি!'

'রোজ রোজ জয়দেবপুর যাচ্ছ কেন?'

'কাজ আছে, তাই যাচ্ছি। কাজ না থাকলে যেতাম না। তোমার অতিরিক্ত কৌতূহল আমার পছন্দ না। কৌতূহল যত কম থাকে তত ভাল।'

ইলা কাতর গলায় বলল, তুমি যাবার আগে রুবাকে কিছু-একটা বলে যাও। বেচারা মন খারাপ করেছে।

'কি বলে যাব?'

'চলে যাচ্ছ যে এটা বলবে।'

'ওকে তা বলার দরকার কি? চলে যাচ্ছি তার জন্য কি অনুমতি নিতে হবে?'

জামান গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল। ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে খানিকটা রাগও দেখাল। সকাল থেকেই সে রেগে আছে।

ইলা রান্নাঘরে ফিরে এসে দেখে রুবা সত্যি কাঁদছে। ওড়নার এক প্রান্ত চোখে

ধরে আছে। নিঃশব্দ কান্না। ইলা তখনি সন্দেহ করেছিল — এই কাণ্ড হবে।'

'কি হয়েছে রে?'

রুবা ফিক করে হেসে ফেলে বলল, অভিনয় করছি। তুমি কি ভেবেছিলে সত্যি সত্যি কাঁদছি?

ইলা কাতর গলায় বলল, তুই যে তোর দুলাভাইয়ের উপর রাগ করে কাঁদছিস তা জানি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। বললাম না ওর মনটা ভাল নেই। শরীরও খারাপ। কাল রাতে ঘুমাতে পারে নি। আয়, ফ্যানের নিচে বসি। ইস্, গরমে ঘেমে কি হয়েছিস।

'দুলাভাই চলে গেছেন?'

'হুঁ। জয়দেবপুর গেছে। ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা হবে।

'জয়দেবপুর কি?'

'জমি নাকি কিনেছে। আমাকে কিছু বলে না।'

'বলে না কেন?'

'সব মানুষ কি এক রকম হয়? একেক জন একেক রকম হয়। ওর স্বভাব হচ্ছে কাউকে কিছু না বলা।'

'তোমাকে বোধহয় বিশ্বাস করে না।'

'বিশ্বাস করবে না কেন? কি যে তোর পাগলের মত কথা। আয় তোর চুল বেঁধে দেই। কাকের বাসা করে রেখেছিস।'

ইলা চিরুনি নিয়ে বসল। অন্তু মিয়া বারান্দায় চাদর গায়ে বসে আছে। তার চোখ লাল। মুখ ফোলা।

রুবা বলল, ওর ঠোঁটে কি হয়েছে আপা?

'পড়ে গিয়েছিলো। তোর আজ কলেজ নেই?'

'আছে।'

'কলেজ ফাঁকি দিয়ে এসেছিস?'

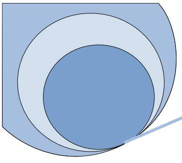
'হুঁ।'

ইলা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, তোর কি কোন টাকা-পয়সার দরকার? দরকার থাকলে বল।

রুবা আনন্দিত স্বরে বলল, দেড়শ' টাকা দিতে পারবে?

'খুব পারব। এরচে' বেশিও পারব। দাঁড়া চুলটা বেঁধে শেষ করি।'

ইলা একটা পাঁচশ' টাকার নোট নিয়ে এলো। সহজ গলায় বলল — সবটাই নিয়ে নে।



'সে কি! সবটা নিয়ে নেব?'

'ফেরত দিতে হবে না। সবটাই তোর।'

'বল কি আপা! এত টাকা কোথায় পেয়েছ?'

'তোর দুলাভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। আর কে আমাকে টাকা দেবে? তুই বসে থাক। আমি রান্না চড়িয়ে আসি। আজ তুই যেতে পারবি না। সারাদিন থাকবি। সন্ধ্যার আগে আগে আমি তোকে যাত্রাবাড়ি রেখে আসব।'

রুবার এখন আর কলেজে যেতে ইচ্ছা করছে না। এখানে বসে থাকতেই ভাল লাগছে। কি হবে পিকনিকে গিয়ে! শুধু হৈচৈ। মেয়েগুলি অবশ্যি খুব মন খারাপ করবে। রুবাকে কলেজে গেলে চেপে ধরবে। কোন অজুহাত কাজে খাটবে না।

রুবা রান্নাঘরে ইলার পাশে এসে বসল। আপা বিয়ের আগে রান্নাবান্না কিছুই জানতো না। এখন কি সুন্দর এটার সঙ্গে ওটা দিচ্ছে। নুন চাখছে। ইলা বলল, — গরমের মধ্যে বসে আছিস কেন? যা ফ্যানের নিচে গিয়ে বস্। আমি লেবুর শরবত বানিয়ে দেই।

'তোমার বাসায় এলেই শুধু লেবুর শরবত। লেবুর শরবত। তুমি বুঝি দুনিয়ার সব লেবু কিনে রেখে দিয়েছ? শরবত লাগবে না। তুমি কাজ কর, আমি দেখি।'

'যা এখান থেকে, যা। রান্নাঘরে বসে থাকবি না। রঙ নষ্ট হয়ে যাবে। বিয়ে আটকে যাবে।'

রুবা মনে মনে হাসল। আপা অবিকল মা'র কথাগুলি বলছে। মা তাদের দু'বোনের কাউকেই রান্নাঘরে ঢুকতে দিত না। মা'র কি করে ধারণা হয়ে গিয়েছিল রান্নাঘরে ঢুকলেই মেয়েদের রঙ নষ্ট হয়ে যাবে। মা সেদিনও বলেছে,

"গরীবের ঘরে রঙটাই হচ্ছে আসল। রঙের জন্যেই গরীবের ঘরের মেয়েদের ভাল ভাল বিয়ে হয়। দেখ না ইলার কেমন বিয়ে হয়ে গেল। একটা পয়সা খরচ হল না। সেটা কি জন্যে হয়েছে? রঙের জন্যে। মুখশ্রী-টুখশ্রী সব বাজে কথা। আসল হচ্ছে রঙ।"

রুবা হেসে বলেছে, আমার তাহলে কি গতি হবে মা? আপার রঙ আর আমার রঙ! আমার তো মনে হচ্ছে এনড্রিন-ফেনড্রিন খেতে হবে। এনড্রিন খেতে কেমন কে জানে। হি হি হি।

মা বিরক্ত হয়ে বলেছেন — গরীবের মেয়ের মুখে এত হাসি ভাল না। কম হাসবি।

মা'র মনের মধ্যে কিভাবে জানি 'গরীব' ব্যাপারটা গেঁথে গেছে। তিনটা বাক্য বললে এর মধ্যে একবার অন্তত 'গরীব' শব্দটা বলবেন। ভাইয়া সেদিন মা'কে

ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। ডাক্তার বললেন, প্রেসার খুব লো। ভাল খাওয়া-দাওয়া করবেন। ডিম দুধ এইসব। মা ফট করে বলে বসলেন — গরীব মানুষ ডাক্তার সাহেব। ডিম দুধ এইসব পাব কোথায়? কি দরকার ছিল এটা বলার? অথচ ডিম দুধের ব্যবস্থা তো হয়েছে। ভাইয়ার যত অসুবিধাই হোক সে চালিয়ে যাচ্ছে।

'রুবা তুই রান্নাঘর থেকে যা তো। কথা শুনছিস না এখন কিন্তু আমার রাগ লাগছে।'

রুবা উঠে পড়ল। শোবার ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ বসল। ঘর খুব সুন্দর করে সাজানো। বিছানার চাদর নীল, তার মধ্যে সাদা ফুল। জানালার পর্দাও তাই। কেমন একটা বড়লোকি ভাব এসে গেছে। আপারা ভালই বড়লোক।

দেয়ালে অচেনা সব মানুষদের বাঁধানো ছবি। দুলাভাইয়ের দিকের আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই। মেয়েদের কি অদ্ভুত জীবন। একদল অচেনা মানুষকে নিয়ে মাঝখানে থেকে জীবন শুরু করতে হয়।

'নে, শরবত নে।'

'শরবত আবার কে চাইল?'

'খা একটু। শরীর ঠাণ্ডা হবে।'

রুবা বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। আগুনের আঁচে ইলার মুখ লালচে হয়ে আছে। মাথার চুল এলোমেলো।

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে আপা। পরীর মত লাগছে। তোমার নামকরণ সার্থক হয়েছে। বাবা যে তোমাকে আদর করে পরী ডাকতেন তা দুলাভাইকে বলেছ?'

'না।'

'কি যে সুন্দর তোমাকে লাগছে আপা।'

'সত্যি বলছিস?'

'হুঁ সত্যি। তোমার পাশে আমাকে লাগছে ঠিক পেত্নীর মত। দেখ না আয়নার দিকে তাকিয়ে। ছিঃ, কি বাজে! ওমা আমার নাকটা কেমন মোটা দেখলে? তোমার আয়না নষ্ট না তো?'

দু'বোন বেশ কিছুক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। রুবা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আয়নায় তাকে সত্যি সত্যি কেমন জানি বাজে দেখাচ্ছে। যদিও সে দেখতে এত বাজে না। আয়নাটা বোধহয় আসলেই খারাপ।

'আপা।'

'কি?'

'আমার সঙ্গে একটু নিউ মার্কেটে চল না। এক জোড়া স্যান্ডেল কিনব — টাকা যখন পাওয়া গেল। দুলাভাই নিশ্চয়ই দুপুরে খেতে আসবে না। যাবে? তোমার বিয়ের আগে, মনে নেই, আমরা শুধু দোকানে দোকানে ঘুরতাম?'

'মনে আছে। তোর জন্যেই ঘুরতাম।'

'বায়তুল মুকাররমে একবার রিকশাওয়ালার সঙ্গে কি কাণ্ড হল তোমার মনে আছে আপা? আমি কেঁদে-টেদে . . . মনে আছে?'

'মনে থাকবে না কেন?'

'ঐ লোকটাকে পরে আর টাকাগুলি দেয়া হয় নি। কি লজ্জার ব্যাপার! টাকাগুলি দেয়া উচিত ছিল। ভদ্রলোক আমাদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ভাবছেন। মাঝে মাঝে ঐ ভদ্রলোকের কথা আমার মনে হয়। তোমার হয় না?'

'হয়।'

'উনার ঠিকানাটা তোমার মনে আছে? থাকলে একদিন চল যাই উনাকে টাকাটা দিয়ে আসি। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবেন। এত দিন পর হঠাৎ।'

ইলা শান্ত গলায় বলল, টাকা আমি উনাকে দিয়ে এসেছি।

রুবা বিস্মিত হয়ে বলল, কবে দিলে?

'দিন-তারিখ মনে করে রেখেছি নাকি? দেয়ার কথা — দিয়েছি।'

'আমাকে বল নি কেন?'

'এটা এমন কি ঘটনা যে তোকে বলতে হবে?'

রুবা অবাক হয়ে বলল — তুমি এমন রেগে যাচ্ছ কেন আপা?

'কি আশ্চর্য, রাগলাম কোথায়?'

'আমি জানি তুমি রেগে গেছ। রাগলে তোমার কান লাল হয়ে যায়, নাক ঘামে। ব্যাপারটা কি আপা?'

'ব্যাপার কিছু না।'

ইলা উঠে রান্নাঘরে চলে গেল। ভাত ফুটছিল, হাঁড়ি নামিয়ে মাড় গালল। বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, আমার চুলটা বেঁধে দে। এক বেণী করবি।

রুবা চিরুনি নিয়ে বসল। ইলা বলল, ভাত খেয়ে তারপর চল নিউ মার্কেটে। বিকেল পর্যন্ত ঘুরব, তারপর তোকে রেখে আসব। রাতে তোদের সঙ্গে খাব। তারপর ভাইয়াকে বলব পৌঁছে দিতে। ভাইয়া কেমন আছে রে?

'প্রথমেই তো একবার বললাম, ভাল।'

'ভাইয়ার বিয়ে দেবার কথা কেউ ভাবছে না, তাই না?'

'না। মা'কে একদিন বললাম। মা মুখ শুকনো করে বলল, ও বউকে খাওয়াবে কি? তাছাড়া কোন ভদ্রলোক এই গরীবের ফ্যামিলীতে মেয়ে দেবে কেন? তাদের কি গরজ?'

'এ আবার কেমন কথা?'

'আমিও মা'কে তাই বললাম। আমি বললাম, আমাদের মত গরীব ফ্যামিলীর একটা মেয়েকেই না হয় আন। মা রেগে অস্থির।'

'এর মধ্যে রাগের কি আছে?'

'রেগেমেগে বলেছে, তোর বাবার সম্মানটা দেখবি না তোরা? কত বড় মানুষ ছিলেন। মা'র মাথার মধ্যে একটা পোকা ঢুকে গেছে।'

দু'টার দিকে দু'জনে খেতে বসল। খেতে বসে রুবা আবার পুরনো প্রসঙ্গ তুলল — নিচু গলায় বলল, ঐ ভদ্রলোকের কথা ওঠায় তুমি রেগে গিয়েছিলে কেন আপা?

'রাগব কেন? রাগি নি। উনি আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছিলেন, তাতে আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল। ব্যস।'

'তুমি মিথ্যা কথা বলছ আপা। অন্য কোন ব্যাপার। উনি শুধু শুধু তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন কেন?'

ইলা জবাব দিচ্ছে না। নিঃশব্দে ভাত খাচ্ছে। রুবা বলল, তুমি একা একাই গেলে উনার কাছে?

'হুঁ।'

'তোমাকে চিনতে পারলেন?'

'না। পরে চিনেছেন।'

'উনি কি ম্যারেড আপা?'

'কি মুশকিল, আমি এতসব জানব কেন? গিয়েছি, টাকা দিয়ে চলে এসেছি।'

'তুমি কি একবারই গিয়েছ না আরো গেছ?'

'তুই কি শুরু করলি বল্ তো, রুবা। জেরা করছিস কেন?'

'জেরা করছি না। জানতে চাচ্ছি।'

'ভাত খেতে বসেছিস্, ভাত খা।'

রুবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইলা খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়ল। রুবা আপার দিকে তাকিয়ে আছে। তার এই আপাটা খুব অদ্ভুত। অনেক রহস্য সে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। রুবার ধারণা আপা একবার না কয়েকবারই গিয়েছে ঐ মানুষটার কাছে। রুবা চেঁচিয়ে

বলল, আপা তুমি নাসিম ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিলে। উনি কি কখনো এসেছিলেন তোমার এই ফ্ল্যাটে?

ইলা কঠিন গলায় বলল, উল্টাপাল্টা কথা কেন বলছিস? নাসিম ভাই এখানে কেন আসবেন?

'আসলে অসুবিধা কি? উনি কি আসতে পারেন না?'

ইলা জবাব দিল না। বাথরুমে ঢুকে গেল। রুবা বাথরুমের দরজার কাছে এসে বলল, বিয়ের পর তোমার মেজাজ অন্য রকম হয়ে গেছে আপা, মা বলছিল, তুমি নাকি ঐদিন বাসায় গিয়ে মা'র সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করেছ।

'অকারণে ঝগড়া করি নি।'

'তুমি তো কখনো এরকম কর না। হঠাৎ কে তোমাকে বদলে দিল।'

'চুপ কর রুবা। মানুষ এক রকম থাকে না। কিছুদিন পরপর বদলায়।'

ইলা বাথরুম থেকে হাসিমুখে বের হয়ে এল। তার মুখ ভেজা। রুবা মুগ্ধ গলায় বলল, তোমাকে কি যে সুন্দর লাগছে আপা।

৪

বন এন্টারপ্রাইজেসের অফিস ঘরে বাবু এবং নাসিমকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। সেখানে ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। নাসিম একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে। সস্তা সিগারেট। উৎকট গন্ধ। দু'জনকেই খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। চিন্তাগ্রস্ত হবার সংগত কারণ আছে। তারা একটা ভাল সাপ্লাইয়ের কাজ পেয়েছিল। মতিঝিলের এক বড় অফিসে কাগজ, পেনসিল, ফাইল, আইকা গাম সাপ্লাই। অফিসের একশ' দশজন কর্মচারীর জন্যে সাবান, গামছা, গ্লাস, কুড়িটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, চল্লিশটা বেতের চেয়ার। তিনটা দশ ফুট বাই বার ফুট কামরার জন্যে জুট কার্পেট। সবই দেয়া হয়েছে। বিল পাস হচ্ছে না। আজ হবে, কাল হবে বলে তারা এক মাস পার করেছে। শেষবার বলে দিয়েছিল, বুধবার সকাল এগারটায় আসতে। আজ বুধবার। তারা দু'জনই গিয়েছিল। বিল যার পাস করবার কথা — রহমান সাহেব, তাদের দু'ঘণ্টা বসিয়ে রাখলেন। একটার সময় ডেকে পাঠালেন। শীতল গলায় বললেন — এখন লাঞ্চ টাইম। বেশি কথা বলতে পারব না। বিল তো আপনারা পাবেন না।

নাসিম হতভম্ব হয়ে বলল, কেন?

'জিনিস ঠিকমত দেন নি। লো কোয়ালিটি জিনিস দিয়েছেন।'

'সব জিনিস তো স্যার আপনাদের দেখিয়ে — আপনাদের এপ্রোভেল নিয়ে তারপর ডেলিভারি দিয়েছি।'

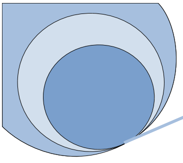
'তা দিয়েছেন, তবে যে জিনিস দেখিয়েছেন সেই জিনিস দেন নি। দিয়েছেন রদ্দি মাল।'

বাবু বলল, স্যার আপনার কথা ঠিক না। যা দেখিয়েছি তাই দিয়েছি। বিশ্বাস করুন, কোন উনিশ-বিশ হয় নি।

'আপনি বললে তো হবে না — মিষ্টির ব্যাপারে ময়রার কথা গ্রাহ্য না। আমাদের নিজস্ব টিম ইনকোয়ারি করেছে। তারা বলেছে — লো কোয়ালিটি।'

'তার মানে কি এই যে আমরা বিল পাব না?'

'না। সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর চেয়ার রিজেক্টেড হয়েছে। যেগুলি দিয়েছেন ফেরত নেবেন, নতুন করে দেবেন। তারপর দেখা যাবে।'



বাবু বলল, আমাদের এটা তো স্যার খুব ছোট ফার্ম। আমাদের অর্থবল নেই বললেই হয় . . .

'আমাকে এসব বলে লাভ নেই। আমি আমার ডিসিশান জানিয়ে দিলাম। কাল ট্রাক নিয়ে এসে ফার্নিচার তুলে নিয়ে যাবেন। আমি আলসারের রোগী। আমাকে টাইমলি খেতে হয়। আপনারা এখন দয়া করে যান, আমি খেতে বসব।'

'আমরা স্যার বাইরে অপেক্ষা করি।'

'অপেক্ষা করে লাভ কিছু নেই। যা বলার বলে দিয়েছি।'

'আমাদের কিছু বলার ছিল স্যার।'

'আমার মনে হয় না আপনাদের কিছু বলার আছে। তারপরেও যদি কিছু বলার থাকে, আমার পি. এ.কে বলুন।'

বাবু এবং নাসিম মুখ শুকনো করে বের হয়ে এল। এই কাজটা এরা খুব আশা নিয়ে করেছিল। তারা যা চেয়েছে তাই দিয়েছে। বড় কাজ, ঠিকমত করলে পরে আরো কাজ পাওয়া যাবে। দু'জনই পরিশ্রমের চূড়ান্ত করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে সবই জলে গেছে। সমস্যাটা কি বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক কি তাদের কাছ থেকে ঘুষ চাচ্ছেন? তাও তো মনে হচ্ছে না। কাজ দেবার সময় তিনি হাসিমুখে বলেছেন — আপনারা দুই ইয়াং ম্যান, ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে ব্যবসায় নেমেছেন দেখে ভাল লাগছে। আপনারা লোয়েস্ট টেন্ডার দিয়েছেন। লোয়েস্ট টেন্ডারে কাজ দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবু আপনাদের দিচ্ছি। আমি চাই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বিজনেসে আসুক। আপনারা সৎভাবে কাজ করবেন, আমি আপনাদের ব্যাক করব। কেউ যদি টাকা-পয়সা চায় — চট করে দেবেন না। আমাকে প্রথমে জানাবেন।

নাসিম হাত কচলাতে কচলাতে বলেছে, আপনার কথা শুনে বড় ভাল লাগছে স্যার। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করার কথা যা বললেন — সেটা অর্ধেক সত্যি। বাবু এম. এ. পাস করেছে। আমার বিদ্যা স্যার আই. এ. পর্যন্ত। থার্ড ডিভিশন পেয়েছিলাম — ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারি নি। আপনি স্যার আমাদের উপর একটু দোয়া রাখবেন।

নাসিম এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলেছে, এবং গদগদ গলায় বলেছে — আপনি স্যার বলতে গেলে আমাদের ফাদারের মত। আমাদের দু'জনেরই ফাদার নেই।

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমরা অনেস্টলি কাজ কর, আমি দেখব।'

সেই একই ভদ্রলোক আজ উল্টো কথা কেন বলছেন বাবু বা নাসিম দু'জনের কারো মাথাতেই তা আসছে না। এতদিন তুমি তুমি করে বলেছেন, আজ বলছেন আপনি করে। মানেটা কি?

সূর্যের চেয়ে বালি সব সময়ই বেশি গরম হয়। অফিসারের চেয়ে পি.এ.র দাপট থাকে বেশি। রহমান সাহেবের পি.এ.র বেলায় এই থিওরি খাটল না। ভদ্রলোক হাসি-খুশি। নিজেই এদের দু'জনকে ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন।

নাসিম বলল, ব্যাপারটা কি ভাই সাহেব বলুন তো। আমরা কি ভুল করেছি?

'ভুল কিছু করেন নি।'

'তাহলে? বিল না পেলে বিশ্বাস করুন ভাই আমার অফিসে যে সিলিং ফ্যান আছে ঐটাতে ঝুলতে হবে। বোনের গয়না বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করেছি। সে দিতে চায় নি। বলতে গেলে জোর করে নিয়েছি। দুলাভাই কিছু জানে না। জানতে পারলে বোনকে সেফটি পিন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে। সমস্যাটা কোথায় আপনি আমাকে বলুন তো।'

'হাজার পঞ্চাশেক টাকা জোগাড় করতে পারবেন?'

'হাজার পঞ্চাশেক টাকা তো আমাদের লাভ হবে না। সব খরচ–টরচ বাদ দিয়ে তেতাল্লিশ হাজার টাকা লাভ হবে। এর মধ্যে সুদের টাকা দিতে হবে আঠাশ হাজার।'

'এইসব আমাকে শুনায়ে কোন লাভ নেই রে ভাই। পঞ্চাশ হাজার টাকা জোগাড় করুন। ব্যবস্থা হবে।'

বাবু হতভম্ব গলায় বলল, কে নেবে এই টাকা?

'আপনার তো সেটা দিয়ে দরকার নাই।'

'আমাদের রক্ত পানিকরা টাকা কে নেবে এটা জানা আমাদের দরকার নেই? কি বলছেন আপনি?'

'আপনারা এই লাইনে খুবই নতুন। টাকাটা কে নেবে বুঝতে পারছেন না কেন? আপনাদের সঙ্গে কে কথা বলছে — আমি। আমি কার লোক? রহমান সাহেবের লোক। কে আপনাদের আমার সঙ্গে কথা বলতে বলল? রহমান সাহেব বললেন। এখন কিছু বুঝতে পারছেন?'

'না, এখনো বুঝতে পারছি না।'

'কেউ এখানে টেন্ডার দেয় না। কেন দেয় না বুঝতে পারছেন না। এখানে টেন্ডার দিয়ে কেউ লাভ করতে পারে না। সব ঠিকঠাক মত চলে — শেষটায় ধরা

খায়। হা হা হা।'

'আপনি হাসছেন? হাসি আসছে আপনার?'

'আপনাদের দু'জনের বেকুবি দেখে হাসছি।'

নাসিম সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, টাকাটা দিতে হবে? সিস্টেমটা কি?

'সিস্টেম খুব সোজা। একটা ঠিকানা দেব — ঐ ঠিকানায় একটা রঙ্গিন টিভি চব্বিশ ইঞ্চি সনি, আর একটা ন্যাশনাল কোম্পানির G-10 ভিসিআর দিয়ে আসবেন। স্যারের মেজো মেয়ের বাসা। যেদিন দিবেন তার পরের দিন বিলে সই হবে। দেব ঠিকানা?'

'দিন।'

ঠিকানা ভদ্রলোকের পকেটে লেখাই ছিল। তিনি ঠিকানা বের করে দিতে দিতে বললেন — এর পরেও আপনাদের হাজার পঁচিশেক টাকা লাভ থাকবে। কথা ছিল সেগুন কাঠ দিয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিল বানাবেন। বানিয়েছেন কড়ই কাঠে। কড়ই কাঠের সিএফটি হল তিনশ' দশ। আর সেগুন এগার শ।'

বাবু বলল, কড়ই কাঠের টেবিল বানানো হয় নি। সেগুন কাঠ দেয়া হয়েছে। আমি নিজে কাঠ কিনে মিস্ত্রিকে দিয়েছি।

'বিশ্বাস করলাম। কাঠ আপনি সেগুন ঠিকই কিনেছেন। মিস্ত্রি দিয়েছে কড়ই, রঙ করে দিয়েছে। আপনাদের একটা উপদেশ দেই। শুনে রাখেন — এই লাইনে আপনাদের কিছু হবে না। অন্য কিছু করুন।'

'অন্য কিছু কি করব?'

'আপনারাই চিন্তাভাবনা করে বের করুন। আপনাদের বয়স কম, চিন্তাশক্তি বেশি। চা খাবেন আরেক কাপ? খান। গরম গরম সিঙারা ভাজা হয়েছে। সিঙারা খেতে পারেন। বলব সিঙারার কথা?'

'না থাক। অনেক মেহেরবানী করেছেন। আর না। আমরা এখন উঠব।'

তারা ফিরে এসেছে অফিসে। দু'জন চুপচাপ বসে আছে। অসহ্য গরম। মাথার উপর ফ্যান আছে। ফ্যান ছাড়ার কথা কারোরই মনে আসে নি। বাবু বলল, কি করবি নাসিম?

'জানি না। বিষ-টিষ খাওয়া যায়। ঐ লাইনেই চিন্তা করছি।'

'রহমান সাহেবের মেয়েটার সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?'

'খালি হাতে দেখা করবি?'

'হুঁ। এ ছাড়া উপায় কি? দেখা করে আমাদের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলব।'

'এটা মন্দ না। প্রয়োজন দেখলে আমি পা জড়িয়ে ধরব। বিষ খাওয়ার চেয়ে পায়ে ধরা সহজ। বড়লোকের মেয়ে। পা মাখনের মত নরম হবার কথা। ধরলে আরাম লাগবে।'

নাসিম নড়েচড়ে বসল। বাবু বলল, সত্যি যাওয়ার কথা ভাবছিস?

'হুঁ। তবে একেবারে খালি হাতে যাব না। বিশাল এক কাতলা মাছ কিনব। বাজারের সবচে' বড় মাছটা। প্রথমে মাছটা দেব। মেয়েরা কেন জানি বড় মাছ দেখলে খুশি হয়। মাছটা দেখে খুশি হবে। খুশি খুশি অবস্থায় আসল ঘটনা বলে পায়ে পড়ে যাওয়া। চল যাই।'

'এখন?'

'হ্যাঁ এখন। মাছ কিনব। ঐ বাসায় তোর যাবার দরকার নেই। আমি একাই যাব। পায়ে ধরা তোকে দিয়ে হবে না। ঐটা হচ্ছে আমার লাইন। তুই থাকলে আমার জন্যেও সমস্যা। ঠিকমত পায়ে ধরতে পারব না।'

'মাছ কিনবি যে টাকা আছে?'

'না, জোগাড় করব।'

'মাছ নিয়ে যাবি কখন?'

'সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় যাব। সন্ধ্যাবেলা মেয়েদের মন একটু দুর্বল থাকে।'

'মেয়েদের মনের এতসব খবর তুই জানলি কিভাবে?'

নাসিম হোহো করে অনেকক্ষণ ধরে হাসল। বাবু তাকিয়ে আছে নাসিমের দিকে। নাসিমের জন্যেই তার খারাপ লাগছে। ছোটখাট মানুষ। খুব ঘামছে। শব্দ করে হাসছে ঠিকই কিন্তু হাসিতে কোন প্রাণ নেই। নাসিম বলল, তুই বাসায় থাকিস। কি অবস্থা রাতে গিয়ে রিপোর্ট করব।

রাত আটটার দিকে প্রায় একমণ ওজনের এক কাতল মাছ নিয়ে নাসিম বাবুদের বাসায় উপস্থিত হল। রুবা চোখ কপালে তুলে বলল, এটা কি?

নাসিম কড়া গলায় বলল, ফাজলামি করিস না তো রুবা। ফাজলামি করলে চড় খাবি। এটা কি বললি কোন্ আন্দাজে? তুই মাছ চিনিস না?

'চিনি। ছোট সাইজের মাছগুলি চিনি — এত বড় মাছ চিনি না। নাসিম ভাই এটা কি তিমি মাছের বাচ্চা? এত বড় মাছ কি জন্যে নাসিম ভাই?'

'খাবার জন্যে। বঁটি আন, মাছ কাটব। শুধু বঁটিতে হবে না — কুড়াল লাগবে। কুড়াল আছে?'

'কুড়াল থাকবে কেন? আমরা কি কাঠুরে?'

কথাবার্তা শুনে সুরমা বের হয়ে এলেন। তিনি স্তম্ভিত হয়ে বললেন, এত বড় মাছ কি জন্যে?

নাসিম হাসিমুখে বলল, খাবার জন্য। অনেকদিন বড় মাছ খাই না। ভাবলাম যা থাকে কপালে আজ একটা বড় মাছ খাব।

'তোমার পাগলামি কবে কমবে বল তো? তোমার কি বড় মাছ খাবার অবস্থা? নুন আনতে পান্তা ফুরায় . . .'

নাসিম হাসতে হাসতে বলল, আমার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। আমার নুনও নাই, পান্তাও নাই . . . তাই বলে এক–আধদিন একটা বড় মাছ খেতে পারব না? বাবু কোথায়?

'টিউশ্যানিতে গেছে।'

'ফিরবে কখন?'

রুবা বলল, দশটার আগে কোনদিন ফেরে না। আজ সকাল সকাল ফিরবে। শরীর খারাপ।

'ওর জন্যে অপেক্ষা করলে রান্নার দেরি হয়ে যাবে। কাটা শুরু করে দি। রুবা যা তো ছাই নিয়ে আয়। খালা আপনি আপনার রান্নার সমস্ত প্রতিভা ব্যয় করে মাছটা রান্না করুন তো দেখি।'

সুরমা কঠিন গলায় বললেন — আমার শরীরের অবস্থা তো জান। এই অবস্থায় আমি রাত দুপরে মাছ রাঁধতে বসতে পারব না।

'আপনাকে কিছু করতে হবে না খালা। আপনি শুয়ে পড়ুন। রান্নাবান্না যা করার আমি আর রুবা মিলে করব। আমি একজন প্রথম শ্রেণীর বাবুর্চি। রুবা হাত লাগা — মাছের ল্যাজটা চেপে ধর।'

'মরে গেলেও আমি মাছের ল্যাজ চেপে ধরব না। হাত গন্ধ হয়ে যাবে। কাল আমার পিকনিক। গন্ধ হাত নিয়ে আমি পিকনিকে যাব?'

'তাহলে যা, চা বানিয়ে আন। খুব কড়া করে বানাবি।'

'নাসিম ভাই, তোমাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন? কারণটা কি?'

'দারুণ একটা ব্যাপার ঘটেছে। তুই বুঝবি না। চা বানাতে বললাম — বানিয়ে আন। চা খেয়ে অ্যাকশানে নেমে যাব। এই মাছ কাটতে মিনিমাম এক ঘণ্টা লাগবে।'

সুরমা বিছানায় শুয়ে আছেন। এম্নিতেই তাঁর শরীর ভাল না। তার চেয়েও বড় কথা, নাসিমকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাঁর ধারণা, নাসিমের পাল্লায় পড়ে বাবুর আজ এই অবস্থা। শিক্ষিত এম. এ. পাস ছেলে হকারদের মত এই অফিসে ঐ

অফিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে — কোন মানে হয়? শিক্ষিত ছেলে চাকরি করবে — দশটা-পাঁচটা অফিস করবে। তার জীবন থাকবে রুটিন-বাঁধা। এইসব কি? ছন্নছাড়া জীবন। যত বদ বুদ্ধি দিচ্ছে নাসিম ছোঁড়া। মাছ নিয়ে ঢং দেখাচ্ছে। মাছ রান্না করবে, খাবে, তারপর বসার ঘরে লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে। যে ছেলে পরের বাড়িতে এমন নির্বিকারভাবে ঘুমায় তাকে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

নাসিম মাছ কাটছে। নাসিমের সামনে চায়ের কাপ হাতে রুবা বসে আছে। সে কৌতূহলী চোখে মাছ কাটা দেখছে। নাসিমের মুখ হাসি হাসি। রুবা অনেকদিন নাসিমকে এত আনন্দিত অবস্থায় দেখে নি।

নাসিমের আনন্দের কারণ আছে। তার কাজ হয়েছে। রহমান সাহেবের মেয়ে সব ঘটনা চুপ করে শুনেছে এবং নাসিমকে অবাক করে রাগে-দুঃখে কেঁদে ফেলেছে। নাসিম ভাবেও নি এই ব্যাপার হবে। মেয়েটি বলেছে — আপনি যদি মাছ এখানে রেখে যান, মাছ আমি খাব না। রাস্তায় ফেলে দেব। বাবাকেও আপনাদের বিল প্রসঙ্গে কিছু বলব না। মাছ আপনি দয়া করে নিয়ে যান। আজ রাতেই আমি বাবাকে যা বলার বলব। বাবার যে এই অভ্যাস আছে আমি সন্দেহ করেছিলাম। কখনো বিশ্বাস করি নি।

নাসিম রুবার দিকে তাকিয়ে বলল, রুবা!

'উঁ।'

'এই মাছটা পুকুরের না নদীর বল তো দেখি।'

'কি করে বলব? মাছের গায়ে তো লেখা নেই 'made in river' কিংবা 'made in pond'.'

'অবশ্যই লেখা আছে। সেই লেখা পড়ার চোখ থাকতে হয়। নদীর রুই মাছ হয় লম্বা। এদের স্রোতের বিরুদ্ধে চলতে হয়। লম্বা না হলে এদের চলাফেরা সমস্যা। পুকুরের মাছগুলি হয় মোটা, গোলগাল। তোকে ভাল জিনিস শিখিয়ে দিলাম।'

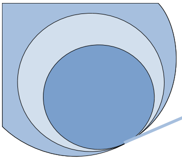
'থ্যাংকস। আরো কিছু শেখাও।'

'বল দেখি — এই মাছটা টাটকা না বাসি?'

'বিশ্রী গন্ধ আসছে। মনে হচ্ছে বাসি।'

'হল না। মাছের তেলটার দিকে তাকিয়ে দেখ। ধবধবে সাদা। এর মানে টাটকা মাছ। এক টুকরা মুখে দিবি, অমৃতের মত লাগবে।'

'নাসিম ভাই, কেন তুমি আজ এত খুশি?'



'খুশি হবার মত কারণ ঘটেছে। অসাধারণ একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হল। আমি আমার এই জীবনে এমন অসাধারণ মেয়ে দেখি নি।'

রুবার মুখ কালো হয়ে গেল। সে নিজের অজান্তেই বড় ধরনের একটা ধাক্কা খেল। তার এই পরিবর্তন নাসিম ধরতে পারল না। ধরতে পারলে সেও চমকে উঠত।

'বুঝলি রুবা, মেয়েটার বাপটাকে চিনি। হারামজাদা নাম্বার ওয়ান। মানুষ সমাজের কলংক। কিন্তু মেয়েটা এত ভাল যে বাপের অপরাধও মেয়ের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা করা যায়।'

'নাম কি মেয়ের?'

'ভাল নাম মেহেরুন্নিসা। ডাকনাম বোধহয় তুহিন। তুহিন বলে ঐ বাড়ির সবাই ডাকছিল।'

'আজই পরিচয় হল?'

'হুঁ।'

'অনেকক্ষণ গল্প করলে?'

'হুঁ। ভেবেছিলাম মিনিট পাঁচেক গল্প করব। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে প্রায় ঘণ্টা খানিক থাকলাম। চা খেলাম। কেক খেলাম। কেকটা অমৃতের মত। কিছু কিছু মানুষ আছে না, প্রথম দেখাতেই মনে হয় — আরে, এই মানুষটাকে তো অনেকদিন ধরেই চিনি। এই মেয়েও সে রকম।'

'আমার চেয়েও ভাল?'

নাসিম হো-হো করে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, তোর ধারণা তুই একটা দারুণ মেয়ে?'

'হ্যাঁ আমার তাই ধারণা।'

'মুখ এমন কালো করে ফেলেছিস কেন? ব্যাপার কি?'

'তোমার অসাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মুখ আলো হয়ে আছে। আমার তো আর কোন অসাধারণ পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয় নি আমার পরিচয় তোমার মত একজনের সঙ্গে যাকে সবাই ডাকে — গিট্টু। কাজেই আমার মুখ অন্ধকার।'

'ঘরে মসলাপাতি কি আছে দেখ। কি ফটফটি হয়েছিস। ফটফট করে কথা। সেই দিন এতটুকু প্যান্ট পরে খালি গায়ে ঘুরঘুর করতে দেখলাম।'

রুবা কঠিন গলায় বলল — নাসিম ভাই, তুমি আমাকে কখনো খালি গায়ে ঘুরঘুর করতে দেখ নি।

'আচ্ছা যা দেখিনি। তুই এত রাগছিস কেন?'

'তুমি আজেবাজে কথা বলবে, আমি রাগব না?'

রুবা উঠে দাঁড়াল। নাসিম বলল, যাচ্ছিস কোথায়?

'মসলা আছে কি–না দেখতে যাচ্ছি।'

রুবা রান্নাঘরে গেল না। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কেন তার এত কান্না পাচ্ছে তা সে নিজেও বুঝতে পারছে না। নাসিম ভাই বলেছে তাঁর একটা অসাধারণ মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাতে তার নিজের এত খারাপ লাগছে কেন? ভাগ্যিস তার এই খারাপ–লাগাটা অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে কি ভয়ংকর ব্যাপার হত!

রুবা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলাল। চোখে মুখে পানি দিয়ে এসে দেখে নাসিম বঁটি দিয়ে হাত কেটে ফেলেছে। রক্ত বের হচ্ছে গলগল করে। নাসিম বলল, তোর "আরোগ্য নিকেতন" চট করে নিয়ে এসে হাতটা বেঁধে দে।

'তুমি তো হাত একেবারে দু' টুকরা করে ফেলেছ!'

'দু' টুকরা করলেও কেন জানি ব্যথা পাচ্ছি না। একটা মজার জিনিস লক্ষ করেছিস রুবা, মাছের রক্ত আর মানুষের রক্ত এক রকম। এইখানে দেখ পাশাপাশি মাছের রক্ত আর মানুষের রক্ত। কোনটা কার বল তো?'

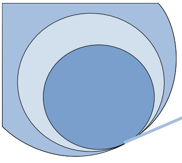
রুবা কিছু বলল না। তার অষুধের বাক্স আনতে গেল। নাসিম কৌতূহলী চোখে মাছের এবং মানুষের রক্ত দেখছে।

৫

জামানের ফিরতে আজও দেরি হবে। গেট খোলা রাখতে হবে বলে গেছে। কি করছে সে জয়দেবপুরে? বাড়ি বানানো কি শুরু করে দিয়েছে? কোত্থেকে পাচ্ছে এত টাকা? হারানো মানিব্যাগের কথা এর মধ্যে একবারও তুলে নি। সে হয়ত ভুলেই গেছে। ইলা ভুলতে পারে নি। ভুলবে কিভাবে? মানিব্যাগটা তো তার কাছেই। সে লুকিয়ে রেখেছে তার স্যুটকেসে। যদি জামান কোন কারণে তার স্যুটকেস খুলে তখন কি হবে? ভয়ংকর কোন কাণ্ড যে হবে তা সে জানে। সেই ভয়ংকর মানে কি রকম ভয়ংকর? মাঝে মাঝে ইলার ইচ্ছা করে ভয়ংকর কাণ্ডটা ঘটে যাক। দেখা যাক সে কি করে।

জামানের রাগ ভয়ংকর। রাগের সময় সে এমনভাবে তাকায়, এমন ভঙ্গি করে যে ইলাকে হতভম্ব হয়ে দেখতে হয়। ইলা রাগ করে না, দুঃখিত হয় না, সে শুধু অবাক হয়ে দেখে। বিস্ময় বোধটাই তার প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। একদিন জামান রেগে গিয়ে এমন ভঙ্গি করল যে ইলার মনে হল সে তাকে চড় মারতে আসছে। যদি সত্যি সত্যি চড় মেরে বসত তাহলে কি বিশ্রী ব্যাপার হত। অথচ ঘটনা কিছুই না। জামান বাথরুমে ঢুকে দেখে বেসিনের উপর একটা আঙটি। ইলার আঙটি। সে আঙটি খুলে হাত ধুয়েছিল। তারপর আর পরতে মনে নেই। এমন কোন ভয়ংকর ঘটনা না। কিন্তু জামান কি বিশ্রী কাণ্ড করল। হাত উঁচিয়ে ছুটে এল — কাণ্ডজ্ঞান নেই? তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই? ইলার বয়স চব্বিশ। এই চব্বিশ বছরের জীবনে সে প্রথম একজনকে দেখল যে হাত উঁচিয়ে তাকে মারতে আসছে।

আঙটি ফেলে আসায় যে মানুষ এমন করেছে সে যদি শুনে ইলার স্যুটকেসে তার মানিব্যাগ। মাঝে মাঝে সেখান থেকে টাকা বের করে সে খরচ করে। তাহলে কি করবে? তার চেয়েও ভয়ংকর কিছু ইলা শুনতে পারে। এমন ভয়ংকর কিছু যে শোনার পর ঐ মানুষটা হাত উঁচিয়ে তাকে মারতে আসবে না কারণ তার সেই ক্ষমতা থাকবে না। সে অবাক বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে ইলাকে দেখবে। কিংবা মাথা ঘুরে নিচে পড়ে যাবে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হবে।



টিভিতে ম্যাকগাইভার শুরু হবার পর ইলা নিচে নামল। ম্যাকগাইভারের কাণ্ডকারখানা দেখবে না। ভয়ে বুক ধড়ফড় করাটা তাহলে আবার শুরু হতে পারে। গেট খোলা রাখার কথা হাসানকে বলে আসতে হবে। পেছনের বাড়ির ঐ ঘটনার পর দশটা বাজার আগেই গেট বন্ধ করে দিচ্ছে।

হাসানকে পাওয়া গেল না। সে বেশির ভাগ সময়ই বারান্দায় ক্যাম্পখাট পেতে ঘুমায়। ঝড়–বৃষ্টির সময়ও একই জায়গা। তখন পর্দার মত কি যেন দেয়। এই ছেলেটির জন্যে বাড়ির ভেতরে কোন জায়গা হয় নি।

আজ ঝড় না হোক, বৃষ্টি হবে। অসহ্য গরম পড়েছে। আকাশ মেঘলা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ইলা বাড়িওয়ালার স্ত্রীকে বলে আসতে গেল। বৃষ্টির মধ্যে জামান এসে যদি দাঁড়িয়ে থাকে, আর যদি গেট খোলা না হয় তার পরবর্তী অবস্থা কি হবে চিন্তা করা যায় না।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী সুলতানা খেতে বসেছেন। আজ তাঁকে অন্যদিনের চেয়েও মোটা লাগছে। গলার চামড়া থলথল করছে। ব্লাউজের বোতাম লাগান নি। তাঁর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ইলাকে দেখে বললেন — বসে যাও তো মা। চারটা ভাত খাও আমার সাথে। রূপচান্দা শুঁটকির দোপেঁয়াজা। ঝাল ঝাল করে রাঁধা । খেয়ে দেখ।

ইলা বলল, আরেক দিন খাব। আজ রাতে গেটটা একটু খোলা রাখতে হবে। হাসানকে যদি একটু বলে দেন।

'দিব, বলে দিব।'

'আরেকটা কাজ আছে। অন্তুকে ডাক্তার দেখাতে হবে।'

'চিন্তা করো না তো। হাসান নিয়ে যাবে। সারাদিন তো ঘরে বসেই ঝিমায়। ঐ দিন মগবাজার যাবে — আমার কাছে রিকশা ভাড়া চায়। চিন্তা করে দেখ কত বড় সাহস। মগবাজার এমন কি দূর। গাধা, তুই হেঁটে চলে যা। এত বাবুয়ানা কিসের?'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথা শুনতে ভাল লাগছে না, আবার চলেও যাওয়া যাচ্ছে না। খাওয়া বন্ধ রেখে একজন এত আগ্রহ নিয়ে গল্প করছে তার সামনে থেকে উঠে চলে যাওয়া যায় না।

'বস না মা, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'অন্তু একা আছে।'

'থাকুক না একা। একটা জিনিস তোমার মধ্যে দেখি যেটা আমার পছন্দ না। কাজের লোক তুমি মাথায় তুলে রাখ। কাজের লোক থাকবে কাজের লোকের মত। কয়েকদিন আগে দেখলাম রিকশা করে যাচ্ছ, চাকর ছোঁড়া বসে আছে তোমার পাশে। সে বসবে নিচে। পায়ের কাছে। পাশে বসালে এরা কোলে বসতে চাইবে।'

'খালা এখন যাই।'

'আহা বস না। পেপসি আছে — পেপসি খাবে। খাও একটা পেপসি। ও রত্না, পেপসি দে।'

ইলাকে বসতে হল। পেপসির গ্লাস হাতে নিতে হল। সুলতানা গলা নিচু করে বললেন, পেছনের বাড়ির ঘটনা পত্রিকায় উঠেছে, দেখেছ? ব্যাপার সব ফাঁস করে দিয়েছে। রেইপ কেইস। হেডিং ছিল — 'গৃহবধূ ধর্ষিতা'। আমি মেয়েটাকে দেখতে গিয়েছিলাম। হাসবেন্ডটা খুব চালাক। চোখে মুখে কথা বলে। আমাকে বলে কি — খালাম্মা দেখেন না — পত্রিকায় বানিয়ে বানিয়ে কি-সব লিখেছে। এখন কাউকে মুখ দেখাতে পারি না। আমি মানহানির মামলা করব। হাতকড়া পরাব। দুজন এডভোকেটের সাথে আলাপও করেছি। বুঝলে ইলা, ইতং বিতং কথা বলেই যাচ্ছে। শাক দিয়ে কি আর মাছ ঢাকা যায়?

পত্রিকায় কি উঠেছে সেই ঘটনার সবটা ইলাকে শুনতে হল। সুলতানা ফিস-ফিস করে বললেন, ঘটনা আরো আছে। এত বড় ঘটনা ঘটল আর মেয়ে সাড়াশব্দ করল না। চুপ করে রইল। এর কারণ কি? চিৎকার দিলেও তো দশজনে শুনত? কিছু মেয়ে আছে এইসব পছন্দ করে . . . তারা চায় রেইপড হতে। একজনে মন ভরে না।

ইলা বলল, খালা আমি উঠি?

'আহা মা বোস না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে। তোমার ছোট বোনটাকে ঐদিন দেখলাম। মুখের কাটিং ভাল। রঙ ময়লা, রঙ ভাল হলে আমার ছেলেটার জন্য বলতাম — কালো মেয়ে বিয়ে করিয়ে কি হবে . . .'

ইলা উঠে পড়ল। আর বসে থাকা যায় না।

টুকটুক করে কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। ইলার বুক ধক করে উঠল। তার কি বিশ্রী কোন অসুখ হয়ে যাচ্ছে? দরজার সামান্য টোকায় পৃথিবীর কেউ এমন চমকে উঠে না। সে চমকাচ্ছে কেন?

'কে?'

'ভাবী আমি। আমি হাসান। আপনি কি আমাকে খুঁজছিলেন?'

'হ্যা খুঁজছিলাম।'

ইলা দরজা খুলতে খুলতে বলল, তোমাকে না একবার বলেছি আপা ডাকতে। আজ আবার ভাবী ডাকছ। দাঁড়িয়ে আছ কেন, ভেতরে আস।

হাসান খুব অস্বস্তি নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ইলা বলল, ভাই, আমাকে আরেকটা কাজ করে দিতে হবে। অন্তুর মুখের অবস্থা দেখ। ফুলেটুলে কি হয়েছে। ডাক্তারের কাছে একটু নিয়ে যাবে।

'জ্বি আচ্ছা।'

'ঐ দিনের কিছু টাকা পাওনা ছিল, ঐ টাকাও তো নাও নি।'

'এখন দিয়ে দিন।'

'আরেকটা কাজ করে দিতে হবে। অন্তু মিয়ার জন্যে একটা মশারি কিনে দিতে হবে। সিঙ্গেল মশারি। কত লাগে সিঙ্গেল মশারির তুমি জান?'

'জ্বি–না।'

'তোমাকে একটা পাঁচশ' টাকার নোট দিচ্ছি — তোমার টাকাটা এখান থেকে রেখে দেবে, অন্তুকে ডাক্তার দেখাবে আর একটা সিঙ্গেল মশারি কিনবে।'

'মশারি কি এখনই কিনব? দোকান বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে।'

'কাল সকালে কিনে দিলেও হবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বস না। একটু চা খেয়ে যাও।'

'আমি চা খাই না ভাবী।'

'আচ্ছা তোমার জন্যে একদিন ভাল কিছু বানিয়ে রাখব। আজ দেরি না করাই ভাল। দেরি করলে হয়ত ডাক্তার পাবে না।'

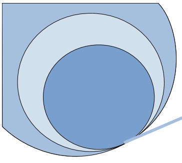
হাসান অন্তুকে নিয়ে নেমে গেল। রাত দশটার মত বাজে। পুরো ফ্ল্যাটে ইলা একা। তার বুক আবার ধকধক করা শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটবে। খুব ভয়ংকর কিছু। পেছনের ফ্ল্যাটে যেমন ঘটেছিল তেমনি কিছু। প্রথমে দরজায় টকটক শব্দ হবে। ইলা বলবে, 'কে'? বাইরে থেকে খুব মিষ্টি গলায় একটি ছেলে বলবে — আপা, আমি টিএন্ডটি' র পিওন। টেলিগ্রাম নিয়ে এসেছি।

ইলা বলবে, দরজা তো খোলা যাবে না। আপনি দরজার নিচে দিয়ে দিন।

'আপা, আর্জেন্ট টেলিগ্রাম — সই করে রাখতে হবে।'

ইলা দরজা খুলবে, তারপর? তারপর কি? ইলা ঘামতে লাগল। বুক শুকিয়ে কাঠ। কখন আসবে হাসান ? বেশি দেরি নিশ্চয়ই করবে না। ইলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। বারান্দা থেকে রাস্তার এক অংশ দেখা যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেও তার খারাপ লাগছে। বারান্দার রেলিংটা নিচু। এখানে দাঁড়ালেই তার কেন জানি লাফিয়ে নিচে পড়ে যেতে ইচ্ছা করে।

জামান ফিরল রাত বারটায়। হাতে কফির একটা কৌটা। বিরস গলায় বলল,



কফি বানাতে পার?

ইলা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। জামান বলল, হ্যাঁ বা না বল। মাথা নাড়ানাড়ি কেন? ভাল করে কফি বানাও। আমি রাতে ভাত খাব না। খেয়ে এসেছি।

'আচ্ছা।'

ইলা কফি বানাতে চলে গেল। সে নিজে না খেয়ে অপেক্ষা করছিল। খিদে মরে গেছে। একা একা এত রাতে খেতে বসার অর্থ হয় না।

জামান অনেক সময় নিয়ে গোসল সেরে বের হল। বারান্দায় অন্তু মিয়ার বিছানা। নতুন মশারি খাটানো হয়েছে। জামান বলল, মশারি পেলে কোথায়?

'কিনেছি। হাসানকে বলেছি, হাসান কিনে দিয়েছে।'

'টাকা?'

'ভাইয়া আমাকে কিছু টাকা দিয়েছে।'

'কিছু মানে কত?'

'অল্প।'

'অ্যামাউন্টটা বলতে অসুবিধা আছে?'

'পাঁচশ'।'

'তুমি টাকা চেয়েছিলে?'

'না।'

'না চাইতেই পাঁচশ' টাকা দিয়ে দিল?'

'ভাইয়ার যখন হাতে টাকা-পয়সা হয় তখন সবাইকেই কিছু কিছু দেয়।'

'উনার হাতে এখন টাকা-পয়সা হয়েছে?'

ইলা জবাব দিল না। কফির কৌটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। আবার তার বুক ধড়ফড় করছে। মিথ্যা কথাটা কি ধরা পড়ে যাবে? সেই সম্ভাবনা কতটুক? খুব অল্প। জামান যাত্রাবাড়িতে কখনো যায় না। ভাইয়ার সঙ্গে তার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। আর দেখা হলেও জামান নিশ্চয়ই টাকার প্রসঙ্গ তুলবে না। এতটা নিচে কি সে নামবে?

ইলা দু' কাপ কফি বানিয়েছে। জামান নিজের কাপে চুমুক দিচ্ছে। ইলা কাপ সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। তার খেতে ইচ্ছা করছে না। বরং কেমন বমি বমি লাগছে। জামান বলল, পাঁচশ' টাকা পেয়েই অন্তুর জন্যে নেটের মশারি, লেপ-তোষক এইসব কিনে ফেলেছ? কোলবালিশ কিনেছ? না-কি এই আইটেম বাদ পড়েছে?

'শুধু মশারি কিনেছি।'

'বাড়াবাড়ি করা তোমাদের সব ভাইবোনদের একটা স্বভাব। নিজে খেতে পায় না শঙ্করকে ডেকে আনে। বাড়াবাড়ি না করলে হয় না?'

ইলা বসে আছে চুপচাপ। এই মানুষটার কথা এখন তার আর শুনতে ইচ্ছা করছে না। সে তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে। চেষ্টা করছে যেন কিছুই তার কানে না আসে। কাজটা কঠিন। সব সময় পারা যায় না। মাঝে মাঝে পারা যায়। নিয়মটা খুব সহজ। যার কথা শুনতে ইচ্ছা করে না তার দিকে তাকাতে হয় কিন্তু কখনো তার চোখের দিকে নয়। ভুলেও না। তাকাতে হয় মানুষটার ভুরুর দিকে, ভাবতে হয় অন্য কিছু। এমন কিছু যা ভাবতে ভাল লাগে। এই মুহূর্তে ইলা ভাবছে বি. করিম সাহেবের কথা।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে ইলা এক বিকেলে কলতা বাজারে উপস্থিত হল। ভদ্রলোক দরজা খুলে রুক্ষ গলায় বললেন, কে, কি চাই?

'বি. করিম সাহেবকে খুঁজছিলাম।'

'আমিই বি. করিম। ব্যাপার কি?'

'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

'আমার কি চেনার কথা?'

'জ্বি। আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

'দেখা হলেও — তুমি যখন আমাকে চিনতে পার নি, আমি তোমাকে চিনব এটা ভাবছ কেন? বাদ দাও এই প্রসঙ্গ। এসেছ কেন?'

'আমি টাকাটা দিতে এসেছি।'

'কিসের টাকা?'

'একবার আপনি আমার রিকশা ভাড়া দিয়েছিলেন।'

'আমি তোমার রিকশা ভাড়া দিতে যাব কেন?'

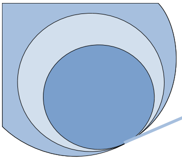
কি কর্কশ কথাবার্তা! খালি গায়ে দরজা খুলেছে, কিন্তু কোন বিকার নেই। খালি গায়েই দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কি পারে একজন তরুণীর সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে? কোন সংকোচ নেই। কোন দ্বিধা নেই। আর তুমি তুমি করেই বা ভদ্রলোক বলছেন কেন?

ইলা তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে টাকা বের করতে করতে বলল — আপনি সত্যি সত্যি চিনতে পারছেন না? আমরা দুই বোন ছিলাম। আমার ছোট বোনটা কাঁদছিল।

'ও আচ্ছা। ইয়েস। মনে পড়েছে। বায়তুল মুকাররমে।'

'জ্বি।'

'কত টাকা দিয়েছিলাম?'



'কুড়ি।'

'গুড। দাও, টাকাটা দাও, কাজে লাগবে। হাত খালি। পারলে আরো কিছু বেশিও দিতে পার। আছে?'

ইলা ভাবল লোকটা ঠাট্টা করছে। কিন্তু না ঠাট্টা না। তিনি সত্যি সত্যি চাইছেন। ইলা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল। তিনি বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে নিলেন।

'এস, খানিকক্ষণ বসে যাও। চা খেয়ে যাও।'

'জ্বি–না।'

'না কেন? খেয়ে যাও। যাও যাও, ভেতরে ঢুকে পড়। আমি চায়ের কথা বলে আসি।'

ভদ্রলোক লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই টাকা নিয়ে চলে গেলেন। হয়ত চায়ের কথাই বলতে গেলেন। ইলা ভেতরে ঢুকল না, আবার চলেও গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রলোক দ্রুত ফিরে এসে বিরক্ত গলায় বললেন — দাঁড়িয়ে আছ কেন? দরজা তো খোলাই ছিল। এস।

ঘর বেশ গোছানো, তবে মেঝেতে একটা বিশাল পাটি পাতা। বড় একটা খাতা পড়ে আছে। খাতার পাশে দু'তিনটা কলম।

'আপনি লিখছিলেন?'

'হুঁ।'

'কি লিখছিলেন?'

'সিনেমার স্ক্রিপ্ট। ঐ আমার পেশা। লেখক হবার ইচ্ছা ছিল, তা হওয়া গেল না, হয়ে গেলাম স্ক্রিপ্ট রাটটার। ছবি দেখ তুমি?'

'খুব বেশি না।'

'জিন্দেগী দেখেছ?'

'জ্বি–না।'

'আমার লেখা। না দেখে ভাল করেছ। দেখলে হলের মধ্যে বমি করে ফেলতে। আমি নিজে লিখে শেষ করবার পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছি।'

ইলা খিলখিল করে হেসে ফেলল। ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন — তোমার হাসি তো খুব সুন্দর। দাঁতও সুন্দর। অভিনয় করবে?

ইলা হকচকিয়ে গেল। বলে কি এই লোক!

ভদ্রলোক হড়বড় করে বললেন — অভিনয় করবার ইচ্ছা হলে আমাকে বলবে। আমার কথা মজিদ আলি ফেলে না। দু'জন নায়িকা আমি মজিদকে দিয়েছি। দু'টাই

হিট। একজনের সাইনিং মানিই এখন এক লাখ। শুনেছি খুব দেমাগ হয়েছে। তবে আমাকে এখানো খাতির করে। দেখা হলে পা ছুঁয়ে সালাম করে।

চা চলে এল। ভদ্রলোক পিরিচে ঢেলে চা খেতে লাগলেন। খানিকক্ষণ সিস দেবার ভঙ্গি করলেন। ঠোঁট সুঁচাল করে ফুঁ দিচ্ছেন। লাভ হচ্ছে না। শব্দ হচ্ছে না। ভদ্রলোক খানিকটা বিরক্ত হলেন। বিরক্তি ঝেড়ে ফেলে বললেন, মজিদ আলি সেদিন বলছিল, অনেকদিন তো হল আরেকটা নায়িকা দিন। দেখি হিট করে কি-না। আমি বলেছি, দেব। তোমার যদি অভিনয় করার শখ থাকে বলবে। লজ্জার কিছু নেই।

'আমার কোন শখ নেই।'

'শখ না থাকলে ভিন্ন কথা।'

ইলা বলল, আমি এখন উঠি?

'আচ্ছা ঠিক আছে। এসো আরেক দিন। বাড়তি টাকা ফেরত নিয়ে যাবে। আমি ঋণ রেখে মরতে চাই না।'

'জ্বি আচ্ছা, আমি আরেক দিন আসব।'

'সপ্তাহখানিক পরে এসো। এর মধ্যে লেখা শেষ হয়ে যাবে। গল্পটা পড়ে শুনাব। নাম কি তোমার?' ইলা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, পরী।

'পরী!'

'জ্বি পরী।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। নাম নিয়ে মিথ্যা বলব কেন?'

'তাও তো ঠিক। নাম নিয়ে মিথ্যা কেন বলবে? আমি খুবই অবাক হয়েছি, বুঝলে — আমি যে স্ক্রিপ্টটা লিখছি তার নায়িকার নামও পরী। তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে, না-কি ভাবছ আমি বানিয়ে বলছি?'

'বিশ্বাস হচ্ছে।'

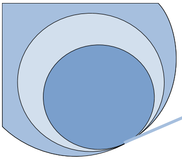
'উঁহু, বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। নাও, এই পৃষ্ঠাটা পড়। এক পৃষ্ঠা পড়লেই বুঝতে পারবে। গোটাটা পড়তে হবে না।'

ইলা পৃষ্ঠাটা হাতে নিল। চোখের সামনে ধরল। পড়ল না। পড়তে ইচ্ছা করছে না।

'কি, আমার কথা বিশ্বাস হল?'

'জ্বি।'

'আমার কাহিনীর পরী নাচ জানে, গান জানে, রাইফেল চালাতে জানে। আবার



বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়। যে সেকেন্ড হয় তারচে' একশ' নম্বর এগিয়ে থাকে।'

'পরী কি নায়িকা?'

'না। পরী নায়িকা নয়, নায়িকার ছোট বোন। নায়িকার ছোট বোনেরই এই অবস্থা। এখন নায়িকার অবস্থা চিন্তা কর। হা হা হা . . .'

ভদ্রলোক হেসেই যাচ্ছেন। ইলা হাসছে না। তার কেন জানি হাসি আসছে না বরং ভয় ভয় লাগছে — মনে হচ্ছে মানুষটা ঠিক সুস্থ নয়। একজন সুস্থ মানুষ এত দীর্ঘ সময় ধরে এমন ভাবে হাসে না। ইলা বলল, আমি যাই?

'আচ্ছা যাও।'

সে ঠিক করে রেখেছিল সে আর কোনদিন যাবে না। কিন্তু দশ দিনের মাথায় সে আবার গেল। তিনি বাসাতেই ছিলেন। সেদিন আর খালি গায়ে না। নতুন মটকার পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর বোতামগুলি বোধহয় সোনার। ঝিকঝিক করছে। তাঁর গা দিয়ে ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। ইলা বলল, আমাকে চিনতে পারছেন?

ভদ্রলোক শুকনো গলায় বললেন, চিনতে পারছি। এখন যাও, বিরক্ত করো না। অন্য একদিন এসো।

লজ্জায় অপমানে ইলার চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছিল। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। ভদ্রলোক বিরসমুখে বললেন, মজিদ আলিকে তোমার কথা বলেছি। তবে ব্যাটা ইন্টারেস্টেড না। শুধু হুঁ-হুঁ করে। অবশ্য একেবারে আশা ছেড়ে দেয়ার কিছু নেই। আমি আবার বলব। পরে এসে খোঁজ নিয়ে যেও।

ইলা বলল, আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি খোঁজ নিয়ে যাব?

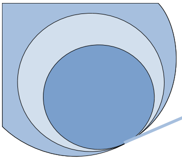
'নায়িকা হিসেবে তোমার কোন সুযোগ হয় কি-না।'

'এই সুযোগের জন্যে তো আমি আপনার কাছে আসি নি।'

'কি জন্যে এসেছ? আচ্ছা, ঠিক আছে কি জন্যে এসেছ পরে শুনব। আজ যাও। আমি বেরুব।'

ইলা চলে এল।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ভাল বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে অন্তুর কান্নার শব্দ কানে আসছে। ছেলেটার এ কী অবস্থা হল! ইলা তার কাছে গেল। ফিসফিস করে



বলল, এত শব্দ করে কাঁদিস না রে অন্তু। উনার ঘুম ভেঙে যাবে। অন্তু সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামাল। ইলা অন্তুর গায়ে হাত দিয়ে দেখে -- অনেক জ্বর।

ইলা পেছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। 6/B ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। শুধু একটা ঘরে না, সব ক'টা ঘরে। এত রাত পর্যন্ত এরা জেগে আছে কেন? কালও দেখেছে অনেক রাত পর্যন্ত ঐ বাড়ির ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। মেয়েটা এখন বোধহয় বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে পারে না। তাদের উচিত এই পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়া। বোকা মেয়েটা কেন এখনো পড়ে আছে? কি আছে এখানে?

আজকের দিনটা শুরু হয়েছে খুব খারাপ ভাবে। সকাল থেকেই বিরাট এক ঝামেলা। অন্তু জ্বরে অচেতন। তার মুখ দিয়ে লালা ভাঙছে। হাসান এসে তাকে কোলে করে নিচে নামিয়েছে। রিকশা করে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। ইলা জামানকে বলল, তুমি যাও না একটু সাথে। জামান মহা বিরক্ত হয়ে বলল — আমি সাথে গিয়ে করব কি?

'জ্ঞান নেই। আমার কেন জানি ভয় লাগছে। না হয় আমি সঙ্গে যাই।'

'তোমার যাবার দরকার নেই। যা করার ঐ করবে। ভ্যাবদা ধরনের ছেলে। এরা কাজ গুছাতে ওস্তাদ। ডাক্তারদের হাতে পায়ে ধরে দেখবে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে।'

ইলার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি ধরনের কথাবার্তা। পরের বাড়ির একটা ছেলে। এত ছোটাছুটি করছে অথচ লোকটার এতটুকু গরজ নেই। দিব্যি শার্টপেন্ট পরছে। যদি ছেলেটার কিছু হয়? অবস্থা আরো খারাপ হলে তো আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে হবে।

'আমি বেবুঝি, বুঝলে। তেমন কিছু হলে বাড়িওয়ালার বাসা থেকে টেলিফোন করে দিও। আর ভয়ের কিছু নেই। ওয়ার্কিং ক্লাসের লোকদের এত অল্পতে কিছু হয় না। দু'একটা স্যালাইন-ট্যালাইন পড়লেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

'ওর আত্মীয়স্বজনদের কোন খবর দেয়া দরকার না?'

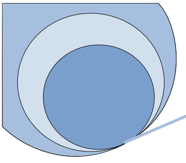
'পাগলের মত কি–সব কথা যে তুমি বল। ওর আত্মীয়স্বজন আমি পাব কোথায়? এদের কি কোন ঠিকানা আছে না পোস্ট বক্স নাম্বার আছে? শোন, হাসানকে বলে রেখো। গেট যেন খুলে রাখে। অফিস থেকে আবার যেতে হবে জয়দেবপুর।'

'ফিরতে দেরি হবে?'

'হুঁ হবে। গেট খোলা রাখতে বলবে।'

দারুণ দুশ্চিন্তায় ইলার সময় কাটতে লাগল। তার মনে হচ্ছে এক্ষুণি হাসান রিকশা নিয়ে ফিরে এসে বলবে — ভাবী, রাস্তার মধ্যে এই কাণ্ড হয়েছে। মরে গেছে বুঝতে পারি নি। এখন কি করব?

হাসান এগারটার দিকে ঘামতে ঘামতে ফিরে এল। সে অসাধ্য সাধন করেছে। অন্তুকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে।



'এক নম্বর ওয়ার্ডে আছে ভাবী। সিট নেই, বারান্দায় শুইয়ে রেখেছে। সিট হলে বিছানায় তুলে দিবে। জমাদারকে দশটা টাকাও দিয়ে এসেছি — বকশিস। জমাদার-টমাদার এরা অনেক কিছু করতে পারে।'

'জ্ঞান এসেছে?'

'হ্যাঁ, এসেছে। আসার সময় দেখে এসেছি কথা-টথা বলছে। স্যালাইন দিচ্ছে। ডাক্তার সাহেব বললেন — ভয়ের তেমন কিছু নেই।'

'ভাই, তুমি আমার বিরাট উপকার করেছ।'

'ভর্তি করাতে খুব ঝামেলা হয়েছে। কেউ কোন কথা শুনে না। এদিকে অচেতন এই ছেলে নিয়ে আমি করি কি! আমার আবার অল্পতেই চোখে পানি এসে যায়। চোখে পানি এসে গেল। তাই দেখে একজন ডাক্তার ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তারদের মধ্যেও ভাল মানুষ আছে ভাবী।'

'তা তো আছেই।'

'ডাক্তার সাহেব ভেবেছেন অন্তু আমার ভাই। আমি তাঁর ভুল ভাঙাই নি। ভাই ভেবেছে ভাবুক। কাজের ছেলে শুনলে হয়ত গা করবে না।'

'এস হাসান, ভেতরে এসে বস। কিছু খাবে?'

'জ্বি-না।'

'একটু কিছু খাও। এস লক্ষ্মী ভাই।'

হাসান লজ্জিত মুখে ভেতরে ঢুকল। নিচু গলায় বলল, কোন চিন্তা করবেন না ভাবী। দুপুরবেলা আমি আবার যাব।

ইলা বলল, হাসপাতাল থেকে কি খাওয়া-দাওয়া দেয়?

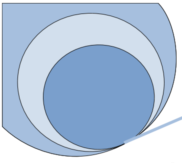
'তা দেয়। আমি তিন টাকা দিয়ে একটা ডাব কিনে দিয়ে এসেছি। পাঁচটা টাকা বেঁচেছিল। ওর হাতে দিয়ে হেঁটে চলে এসেছি।'

'সে কি!'

'খামোকা টাকা খরচ করে লাভ কি বলেন? তাছাড়া হাঁটতে আমার ভালই লাগে।'

ইলা হাসানকে চা-বিসকিট এনে দিল। হাসান মাথা নিচু করে খাচ্ছে। এক পলকের জন্যেও এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে না। তার পরনে আকাশী রঙের একটা শার্ট। শার্টটা নতুন, তবে পেটের কাছে পয়সার সাইজের একটা পোড়া দাগ আছে। হাসান একটা হাত সব সময় সেখানে দিয়ে রেখেছে।

বেচারার শার্ট বোধহয় এই একটাই। সব সময় এই একটা শার্টই গায়ে দিতে



দেখা যায়। ইলা মনে মনে ঠিক করে ফেলল — আজই সে একটা শার্ট কিনবে। খুব সুন্দর একটা শার্ট।

'ভাবী যাই।'

'আচ্ছা ভাই এস।'

'আমি দুপুরে আবার যাব। আপনি চিন্তা করবেন না ভাবী।'

হাসান পুরোপুরি চলে গেল না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইলা বলল, কিছু বলবে?

'ভাবী, আপনি ভাইজানকে আমার জন্যে একটা চাকরির কথা বলবেন। যে কোন চাকরি। ছোট হলেও ক্ষতি নাই।'

ইলা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। হাসান মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল — এখানে আর থাকতে পারছি না ভাবী। প্রেসে সীসা চুরি হয়েছে। সবাই বলছে আমি চুরি করেছি। আমার কোথাও যাবার জায়গা নাই।

'আমি ওকে বলব। অবশ্যই বলব। আজই বলব। কিন্তু ও বোধহয় কিছু করতে পারবে না।'

'আপনার আর কেউ চেনা নাই? খুব ছোট চাকরি হলেও আমার কোন অসুবিধা নাই।'

ইলাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে এত বড় একটা পুরুষ মানুষ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ইলা কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

হাসান নিজেকে সামলে নিল। হঠাৎ কেঁদে ফেলাতে নিজেই লজ্জা পাচ্ছে। অস্বস্তি ঢাকতে পারছে না। ইলা পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে হাসিমুখে বলল, তোমাকে বলেছিলাম আমাকে আপা ডাকতে। তুমি কিন্তু ভাবীই বলে যাচ্ছ।

'মনে থাকে না।'

'মনে না থাকলে তো হবে না। মনে থাকতে হবে।'

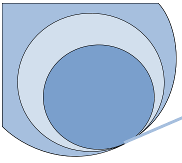
হাসান চলে যেতে ধরল। ইলা দরজা ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মনে হচ্ছে হাসান আরো কিছু বলতে চায়। বলার সাহস পাচ্ছে না। ইলা বলল, কিছু বলবে?

হাসান হড়বড় করে বলল, আমার সম্পর্কে কিছু শুনেছেন আপা?

'না, কি শুনব?'

'পরে বলব। আজ যাই আপা। বাজারে যেতে হবে।'

অনেকদিন পর ইলা আজ আবার ঘুরতে বের হয়েছে। ফ্ল্যাট তালাবন্ধ। হাসানকে বলা আছে, সে লক্ষ্য রাখবে। রাত করে ফিরলেও আজ কোন সমস্যা নেই



— জামানের ফিরতে দেরি হবে। জয়দেবপুরে এই মানুষটা কি করছে? কে জানে কি করছে। এখন আর জানার আগ্রহ হচ্ছে না।

ইলা আজ কোথায় যাবে কিছু ঠিক করে নি। রিকশায় উঠে ঠিক করবে। বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়েছে। কত সে নিজেও জানে না। গুনে নেয় নি। জামানের মানিব্যাগ থেকে চোখ বন্ধ করে কয়েকটা নোট তুলে নিয়েছে। ইলা ঠিক করে রেখেছে — সব টাকা খরচ করবে। আবার ফ্ল্যাটে ফিরে আসবে খালি হাতে। সঙ্গে কিছু থাকবে না। কিছু থাকলে জামান টের পেয়ে যাবে।

ভাইয়ার জন্যে কোন একটা উপহার কিনতে পারলে ভাল হত। তা কেনা যাবে না। ভাইয়া কোন এক প্রসঙ্গে জামানকে বলে ফেলতে পারে। তাদের বাড়ির কারোর জন্যেই কিছু কেনা যাবে না। কি বিশ্রী সমস্যায় ইলা পড়েছে। টাকা আছে কিন্তু খরচ করতে পারছে না।

কোথায় যাওয়া যায়? ভূতের গলিতে জামানের বড় বোন থাকেন। হঠাৎ তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলে কেমন হয়? ভদ্রমহিলা চমকে উঠবেন কারণ তাদের বাড়িতে যাওয়া ইলার নিষেধ। জামান বিয়ের পরদিনই বলেছে — আমার কোন আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ রাখবে না। আমার বড় বোন যদি আসে দরজাও খুলবে না। দরজা খোলাও নিষেধ।

'কেন?'

'আমি তাদের পছন্দ করি না।'

'তারা কি করেছে?'

'এত ইতিহাস বলতে পারব না। পছন্দ করি না। করি না। চাই না এদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ থাকুক।'

জামানের বড় বোনকে ইলার অবশ্যি বেশ পছন্দ হয়েছিল। মোটামুটি মানুষ। চোখমুখে ভীত ভীত ভাব। অকারণেই চমকে উঠছেন। তিনি ইলাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আমি ভূতের গলিতে থাকি। ভূতের গলিতে ঢুকেই একটা ওষুধের দোকান — ডেল্টা ফার্মেসী। ফার্মেসীর উল্টো দিকে তিনতলা বাড়ির দোতলায় থাকি। মনে থাকবে?

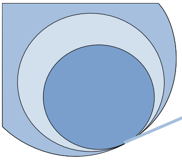
'থাকবে।'

'ফার্মেসীটার নাম কি বল তো?'

'ডেল্টা ফার্মেসী।'

'তুমি আসবে তো?'

'আসব।'



'জামানকে না জানিয়ে আসবে। জামানকে বললে সে আসতে দেবে না। অকারণে রাগ করবে। কি দরকার?'

ইলার বিয়ের সময় জামানের বড় বোন ছাড়াও বাজিতপুর থেকে জামানদের অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছিলেন। জামানের বাবা এসেছিলেন। ভদ্রলোকের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। হাত ধরে ধরে চলাফেরা করাতে হয়। জামান তাঁকে বলল, আপনি কি জন্যে এসেছেন? তিনি থতমত খেয়ে বললেন — বিবাহ দেখতে আসলাম।

'আপনি তো চোখেই দেখেন না। বিবাহ দেখবেন কি? খামোকা বাজে ঝামেলা করেন। আসা–যাওয়ার খরচ আছে না? যাওয়ার সময়ও তো ভাড়া দিতে হবে। হবে না?'

'হবে।'

'তাহলে? এতগুলা মানুষ নিয়ে এসেছেন। থাকবেন কোথায়?'

'তোমার এইখানে থাকব। আর যাব কই?'

'দুই রুমের ফ্ল্যাট — থাকবেন বললেই তো হয় না। এ রকম উল্টাপাল্টা কাজ আর করবেন না। আপনি থাকতে চান থাকুন — অন্যদের আমি হোটেলে দিয়ে আসব।'

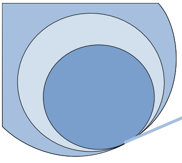
'তাহলে আমাকেও হোটেলে দিয়ে আস। সবাই এক সঙ্গে থাকি।'

'সেটাও মন্দ না।'

জামানের বাবা হোটেল থেকেই বাড়ি চলে গেলেন। প্রতি পনের দিন পরপর চিঠি লেখেন। জামান সেই সব চিঠির বেশির ভাগই পড়ে না। হাতে চিঠি দিলে হাই তুলে বলে — ফেলে দাও। কি লেখা আমি জানি — আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ? গত সপ্তাহে মনি অর্ডার পাইয়াছি। টাকার পরিমাণ আরো কিছু বাড়াও — দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে . . . ইলা কিছু কিছু চিঠি পড়েছে। আসলেই তাই। চিঠিগুলিতে টাকা–পয়সা ছাড়া অন্য কোন কিছুরই উল্লেখ নেই।

ইলা প্রথম গেল বায়তুল মুকাররাম, সেখান থেকে রিক্সা করে নিউ মার্কেট। নিউ মার্কেট থেকে বেবিটেক্সি নিয়ে কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ। সেখানে সুন্দর একটা শপিং সেন্টার না–কি হয়েছে। সে কিছুই কিনল না। ঘুরে ঘুরে বেড়াল। ঐ শপিং সেন্টারে একটা বাচ্চা মেয়ে এক প্যাকেট চকলেট কেনার জন্যে খুব চাপাচাপি করছিল। মা কিছুতেই কিনে দেবে না। ইলা এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি কিনে দিলে আপনি কি রাগ করবেন? মেয়েটির মা অবাক হয়ে বললেন, আপনি কিনে দেবেন কেন? সে কি!

'যদি আপনি অনুমতি দেন তবেই কিনতে পারি, প্লীজ।'



চকলেটের টিনটা কিনতে চারশ' টাকা চলে গেল। টাকাটা দেবার সময় ইলার বুক খানিকক্ষণ খচখচ করল। এতগুলি টাকা! সেই 'খচখচ' ভাব স্থায়ী হল না। বাচ্চা মেয়েটি চকলেটের টিন হাতে লাফাচ্ছে। দেখতে ভাল লাগছে। ভদ্রমহিলা বললেন, আন্টিকে স্লামালিকুম দাও। বল — চকলেটের জন্যে ধন্যবাদ।

মেয়েটি কোন কিছু বলাবলির ধার দিয়ে গেল না। সে সমানে লাফাচ্ছে।

ইলা যাত্রাবাড়িতে উপস্থিত হল একটার দিকে। সুরমা দরজা খুলে দিলেন। ইলা হাসিমুখে বলল, কেমন আছ মা? রান্না হয়েছে? প্রচণ্ড খিদে। ভাত খাব। বাসা খালি কেন? কেউ নেই?

'না।'

'গেল কোথায়?'

সুরমা বিরক্ত গলায় বললেন, দুপুর বেলায় কেউ বাসায় থাকে না-কি? রুবা গেছে পিকনিকে। লঞ্চে করে মানিকগঞ্জ যাবে। আবার ফিরে আসবে।

'ভাইয়া? ভাইয়া কোথায়?'

'জানি না কোথায়। বাউণ্ডুলেটার সঙ্গে কোথায় কোথায় যেন ঘুরছে। ছোঁড়াটা বাবুর মাথা খেয়েছে। এখন বলছে ভাতের হোটেল দিবে। বাবু তাতেই লাফাচ্ছে।'

'তুমি মনে হয় খুব রাগ করছ।'

'রাগ করব না? ভদ্রলোকের ছেলে ভাতের হোটেল দেবে কেন?'

ইলা হাসিমুখে বলল, ভদ্রলোকের ছেলেরা দেবে পোলাওয়ের হোটেল।

সুরমা বিরক্ত গলায় বললেন, সব কিছু নিয়ে হাসবি না। এটা কোন হাসিঠাট্টার বিষয় না। হাতমুখ ধুয়ে আয়। ভাত বাড়ি।

'ভাত খাব না মা। এখন চলে যাব।'

'একটু আগে না বললি খাবি।'

'এখন বলছি — খাব না। কারণ একটা জরুরী কাজ বাকি আছে।'

'জরুরী কাজটা কি?'

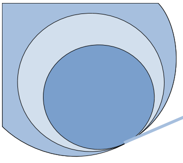
'তোমাকে বলা যাবে না।'

'ভাত খেয়ে যা। কতক্ষণ লাগবে ভাত খেতে?'

'একবার তো মা বললাম, খাব না। কেন বিরক্ত করছ?'

সুরমা বিস্মিত হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইলা বাথরুমে ঢুকল। অনেক সময় নিয়ে গোসল করল, বের হয়ে এল হাসিমুখে।

'ভাত দাও মা।'



সুরমা ভাত বাড়লেন। তিনি আগ বাড়িয়ে আর কোন কথাবার্তায় গেলেন না। খাবার আয়োজন খুবই নগণ্য। ডাল, বেগুন ভর্তা, ভাত। ইলার জন্যে একটা ডিম ভাজা করা হয়েছে। খেতে খেতে ইলা বলল, ভাইয়ার ব্যবসা মনে হয় জলে ভেসে গেছে। সুরমা তিক্ত গলায় বললেন, সঙ্গ দোষে ওর সব গেছে। ছোটলোকটা মাথার মধ্যে একেক বার একেকটা জিনিস ঢোকায় — বাবু লাফায়। আরে গাধা, তোর নিজের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।

'ছোটলোক কাকে বলছ মা, নাসিম ভাইকে?'

'আর কাকে বলব।'

'আমরা কি বড়লোক?'

সুরমা বিরক্ত গলায় বললেন, তুই কি এর মধ্যে প্যাঁচ ধরছিস না-কি? তোদের সঙ্গে তো কথাবার্তা বলাই মুশকিল। রাগের মাথায় ছোটলোক বলেছি।

'কোন সময়ই এটা বলা উচিত না মা। কারণ তুমি ভাল করেই জান নাসিম ভাইকে শুধু ভাইয়া না, আমি, রুবা, আমরা দু'জনই খুব পছন্দ করি। আমাদের খুব পছন্দের একজন মানুষকে তুমি কথায় কথায় ছোটলোক বলতে পার না।'

সুরমা কঠিন গলায় বললেন, বলে বিরাট অন্যায় করেছি — এখন আমাকে কি করতে হবে। পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে?

'তোমার তিরিক্ষি মেজাজ হয়েছে মা। মনে হয় ব্লাড প্রেসার আরো নেমে গেছে। দুধ-ডিম কি তুমি ঠিকমত খাচ্ছ?'

সুরমা কিছু বললেন না। মা এবং মেয়ে দু'জন দু'জনের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। সুরমাই প্রথম চোখ নামিয়ে নিলেন। ইলা হাসিমুখে বলল, চোখে চোখে তাকিয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় তুমি কখনো জিততে পার না মা। তুমি সব সময় হেরে যাও। কোনদিন পারবেও না।

'এটা কি ধরনের কথা?'

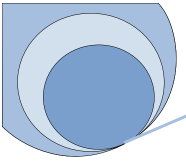
ইলা হেসে ভাত খাওয়া শুরু করল। খাওয়া শেষ করে সহজ ভঙ্গিতে বলল, ঘরে পান আছে মা? একটা দাও তো।

সুরমা পান এনে দিলেন। ইলা বলল, আমি খানিকক্ষণ ঘুমুব মা। তুমি আমাকে ঠিক পাঁচটার সময় ডেকে দেবে।

'আমার ঘরে ঘুমুবি? ঐ ঘরটায় আলো আসে না। আরাম করে ঘুমুতে পারবি। রুবার ঘরে রোদ আসে।'

'আমার ঘরটা এখন হয়েছে রুবার ঘর?'

'বিয়ের পর — স্বামীর ঘরই ঘর। আর কোন ঘর — ঘর না।'



'জামানের সঙ্গে তোমার মিল আছে মা। জামানও এই ভাবে কথা বলে।'

সুরমা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, জামান জামান করছিস কি রে?

'কি বলব? জামান সাহেব? নাকি মিস্টার জামান?'

সুরমা কিছু বললেন না। ইলা হাসিমুখে বলল, তুমি আমাকে খুব ভয় পাও — তাই না মা? সুরমা ক্ষীণ গলায় বললেন, বিয়ের পর তুই কি রকম পাগলাটে হয়ে গেছিস। আমি তোকে ভয় পাব কেন?

'ভয় পাও না, তাহলে এমন ফিসফিস করে কথা বলছ কেন?'

সুরমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। ইলা রুবার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। শুধু দরজা না, জানালাও বন্ধ করল। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল।

পাঁচটায় ইলাকে ডেকে তোলার কথা। সুরমা জেগে বসে রইলেন। ঠিক পাঁচটায় দরজা ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে ইলা বলল, ধাক্কাধাক্কি করবে না তো মা। আমার এখনো ঘুম আসে নি। তোমাকে ডাকতে হবে না। আমি নিজেই উঠব।

'দিন খুব খারাপ করেছে ইলা। ঝড়বৃষ্টি হবে।'

'হোক।'

'সন্ধ্যা হয়ে গেলে তোর বাসায় যাবি কিভাবে? বাবু রাত দশটা–এগারটার আগে বাসায় ফেরে না। তোকে দিয়ে আসবে কে?'

'আমাকে দিয়ে আসতে হবে না। আমি এখানেই থাকব। তুমি আর বিরক্ত করো না তো মা। আমি এখন ঘুমুব।'

ইলার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে আগে। রুবা ফেরে নি। ঘরে সুরমা একা। তাঁর মনে হচ্ছে রুবার কোন–একটা সমস্যা হয়েছে। হয়ত লঞ্চ ডুবে গেছে। কিংবা লঞ্চের উপর ছোটাছুটি করতে গিয়ে পা পিছলে রুবা পানিতে পড়ে গেছে। রুবা সাঁতার জানে না।

সুরমা তাঁর মনের অস্থিরতা কিছুতেই কমাতে পারছেন না। বাবুও বাসায় নেই, কাকে তিনি কি বলবেন? ইলার ঘুম ভাঙতে তিনি ব্যাকুল গলায় বললেন, রুবা তো এখনো ফিরল না। বলে গিয়েছিল চারটার সময় ফিরবে।

ইলা হাই তুলতে তুলতে বলল, পিকনিক–টিকনিকে গেলে খানিকটা দেরি হয়। এসে যাবে।

'তোর দুশ্চিন্তা লাগছে না?'

'না।'

ইলা চুল আঁচড়াল। শাড়ি ঠিকঠাক করে, হ্যান্ডব্যাগ হাতে নিয়ে বলল, যাই মা।

'চলে যাচ্ছিস?'

'হুঁ।'

'তুই না বলেছিলি থাকবি।'

'থাকব না। ভাল লাগছে না। জামান সাহেব যদি কোন কারণে আজ আগেভাগে এসে পড়েন তাহলে তালাবন্ধ বাসা দেখে কি করবেন কিছুই বলা যায় না। আমাকে হয়ত কেটে কুচিকুচি করে তেল মসলা দিয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলবেন।'

সুরমা স্তম্ভিত গলায় বললেন, তোর কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে?

ইলা হাসল। সুন্দর করে হাসল। সেই হাসি দেখে সুরমা ভরসা পেলেন। আদুরে গলায় বললেন, থেকে যা না। রাতে বাবু ফিরলে তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। জামাইকে বুঝিয়ে বলবে।

'বুঝিয়ে কি বলবে?'

'বলবে — রুবা বাসায় ফিরছিল না, আমি ভয়ে অস্থির হয়ে কান্নাকাটি করছিলাম। আমাকে সামাল দেবার জন্যে তুই থেকে গেছিস। তুই থাকতে চাচ্ছিলি না — আমিই জোর করে রেখে দিয়েছি . . . '

'মা তুমি তো খুব গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পার।'

সুরমার মুখ কালো হয়ে গেল। ইলা বলল, মা আমি যাচ্ছি। রুবাকে নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করবে না। ও আমার মত বোকা মেয়ে না — ধর, যদি লঞ্চ ডুবেই যায়, সে ঠিক সাঁতরে পারে উঠে আসবে। সে সাঁতার জানে না। তারপরেও কোন না কোনভাবে ঠিকই ম্যানেজ করবে।

সুরমা বললেন, আমার উপর তোর এত রাগ কেন রে ইলা?

'তোমার উপর আমার এত রাগ কেন তা তুমি ভাল করেই জান মা।'

'আমি যা করেছি, তোর ভালর জন্যেই করেছি।'

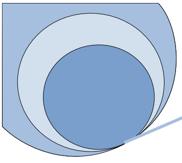
'ভালর জন্যে করেছ?'

'হ্যাঁ। আজ তুই বুঝতে পারছিস না। একদিন বুঝতে পারবি।'

'সেই একদিনটা কবে?'

'যেদিন তোর বড় মেয়ের বিয়ের বয়স হবে সেদিন। আজ আমি যা করেছি সেদিন তুইও ঠিক তাই করবি।'

ইলা আবার হাসল। সুরমা এগিয়ে এসে মেয়ের হাত ধরলেন। ইলা বলল, হাত ছাড় মা। মসলা পিষে পিষে তোমার হাতে কড়া পড়ে গেছে। আমার ব্যথা লাগছে। সুরমা হাত ছাড়লেন না। কোমল গলায় বললেন — বোস। একটু বোস। কেতলি চুলায় দিয়ে এসেছি। পানি ফুটছে। চা খেয়ে যা। তোর সঙ্গে খাব বলে আমিও চা খাই নি।



'ঠিক আছে মা, বসছি। যাও, চা বানিয়ে আন।'

চা বানাতে বানাতে সুরমা ঠিক করে ফেললেন — ইলাকে গুছিয়ে কথাগুলি কি করে বলবেন। অসংখ্যবার তিনি নিজের মনে কথাগুলি গুছিয়ে রেখেছেন। কখনো বলতে পারেন নি। আজ হয়ত বলতে পারবেন।

এক বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তিনি মা হিসেবে সেই পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। তিনি যেভাবে পরিস্থিতি সামলেছেন — অন্য মায়েরাও ঠিক একইভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন। তিনি কোন ভুল করেন নি। এই ব্যাপারটা ইলাকে বোঝাতে হবে। ইলা অবুঝ নয়। সে বুঝবে।

ব্যাপারটা শুরু হয় এই ভাবে। তিনি বছর দুই আগে ভয়ংকর আতংকে নিয়ে লক্ষ্য করেন নাসিম এ বাড়িতে এলেই তার বড় মেয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ফেল করা আই. এ. পাস এক ছেলে। যার বাবা মোটর মেকানিক। কিছুদিন পরপর বিয়ে করা যার প্রধান হবিগুলির একটি। যার সর্বশেষ বিয়েটি হল জনৈক রিকশাওয়ালার চৌদ্দ বছরের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। ইলার রুচি এত নিচে কি করে নামে তিনি ভেবে পান না। তাঁর এম. এ. ক্লাসে পড়া মেয়ে কেন নাসিম নামের রাস্তার একটা ছেলের গলার স্বর শুনলে আনন্দে ঝলমল করে উঠে? কি আছে এই ছেলের? যেমন তার ভাঁড়ের মত চেহারা ঠিক তেমনি ভাঁড়ের মত আচার-আচরণ। হো-হো করে হাসা ছাড়া এই ছেলে আর কি পারে! তার কোন্ কাজটা স্বাভাবিক? একদিন সন্ধ্যায় রিকশায় করে একটা স্যুটকেস, একটা ট্রাংক নিয়ে উপস্থিত। দাঁত বের করে বলল, কয়েকটা দিনের জন্যে আশ্রয় দিতে হয় খালা। বাবা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। ভদ্রভাবে বের করে নি, স্পঞ্জ পেটা করেছে।

রুবা বলল, স্পঞ্জ পেটাটি কি?

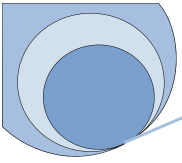
'জুতা পেটার চেয়েও নিম্নমানের। স্পঞ্জ স্যান্ডেল নিয়ে তাড়া করেছে . . .'

'কেন?'

'কে জানে কেন? রাত বারটার সময় মদফদ খেয়ে বাসায় ফিরেছে। ঐ জিনিস খেলে পিতাজীর মেজাজ থাকে খারাপ। নতুন মা'র সঙ্গে বোধহয় হয়েছে গণ্ডগোল। রাগ ঝাড়বার লোক পায় নি। আমাকে পেয়েছে। স্পঞ্জের স্যান্ডেল নিয়ে তাড়া করেছে। হা হা হা।'

সুরমা বললেন, হাসছ কেন? এর মধ্যে হাসির কি আছে?

'ব্যাপারটা খুবই হাসির ছিল খালা। আপনি দেখেন নি তো, তাই বুঝতে পারেন নি। দেখলে বুঝতেন। বাবা আমার পিছনে পিছনে ছুটছে। ভয় পেয়ে আমার ছয় বোন ছুটছে ছ'দিকে। নতুন মা ছুটছে আরেক দিকে। ভয়াবহ অবস্থা। এর মধ্যে



আমার নতুন মা আবার আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। নতুন মা'র অবস্থা থেকে বাবার মন দুঃখে নরম হয়ে গেল। স্যান্ডেল হাতে মা'র দিকে ছুটে গেলেন। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন — ব্যথা লাগছে ময়না?'

গল্প শুনে সুরমা'র রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল আর হেসে ভেঙে পড়ছে তাঁর বড় মেয়ে! তার এত আনন্দ?

ইলা বলল, নাসিম ভাই তুমি আমাদের সঙ্গে কতদিন থাকবে?

'যতদিন থাকতে দিস ততদিন।'

'সারাজীবন থাকতে হবে । আমরা তোমাকে যেতে দেব না।'

ইলার কথা শুনে সুরমা'র গা হিম হয়ে গিয়েছিল। মেয়ে কি বুঝতে পারছে সে কি সর্বনাশা কথাবার্তা বলছে। এই বুদ্ধি কি মেয়ের আছে? মেয়ের যে এই বুদ্ধি নেই তা পুরোপুরি বুঝতে তাঁর দেরি হল না। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ইলার বিয়ে নিয়ে। যাকে পান তাকেই বলেন। অনেকে আগ্রহী হয়ে আসে। মেয়ে দেখে খুশি হয়। খুশি না-হবার কোন কারণ নেই। কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়ে ভেঙে যায়। আজকাল শুধু রূপে বিয়ে হয় না। রূপের সঙ্গে আরো অনেক কিছু লাগে। সেই অনেক কিছু তাঁর নেই। তিনি লক্ষ্য করেন যতবার বিয়ে ভাঙে ততবারই আনন্দের আভা দেখা যায় ইলার চোখেমুখে। যেন খুব সুখের কোন ঘটনা ঘটেছে। সুরমা নিজেকে বুঝিয়েছেন — এটা আর কিছুই না — ভান। মেয়ে অভিনয় করছে। বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া যে কোন মেয়ের জন্যেই ভয়াবহ অপমানের ঘটনা।

সুরমার ধারণা যে ঠিক না তার প্রমাণ পেলেন এক রাতে। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়েছেন। শরীর ভাল না। গভীর রাতে দরজায় ধাক্কা পড়ল। ইলা চাপা গলায় ডাকল, মা। একটু দরজা খোল।

তিনি বিস্মিত হয়ে বিছানা ছেড়ে নামলেন। বাতি জ্বালালেন, দরজা খুললেন। ইলা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর এতদিনের চেনা মেয়েকে তিনি চিনতে পারছেন না। যেন অন্য কোন মেয়ে। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে । থরথর করে কাঁপছে। তিনি বললেন, কি হয়েছে রে?

'তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

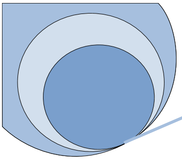
'আয় ভেতরে আয়। তোর কি শরীর খারাপ?'

'না। শরীর খারাপ না, শরীর ভাল। বাতি নেভাও মা।'

'বাতি নিভাতে হবে কেন?'

'আলো জ্বালা থাকলে কথা বলতে পারব না।'

সুরমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। ইলা কি বলবে তিনি বুঝতে পারছেন। সেই



কথা শোনার মত সাহস তাঁর নেই।

'বল কি বলবি।'

'আমার বিয়ে নিয়ে তুমি যে চারদিকে ছোটাছুটি করছ তার দরকার নেই মা।'

'দরকার নেই কেন?'

'আমি আমার নিজের পছন্দমত একটা ছেলেকে বিয়ে করব।'

'আছে এ রকম কেউ?'

ইলা জবাব দিল না। সুরমা ইলার ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনলেন। তিনি শান্ত গলায় বললেন, সেই ছেলেটা কি নাসিম? ইলার কান্নার শব্দ বাড়ল। এবারো জবাব দিল না।

সুরমা বললেন, তুই যে নাসিমকে বিয়ে করতে চাস তা কি সে জানে?

'না জানে না।'

'কিছুই জানে না?'

'না।'

'তুই তাকে চিঠিফিঠি কিছু দিয়েছিস?'

'না।'

'আমার গা ছুঁয়ে বল।'

'গা ছুঁয়ে কিছু বলতে হবে না মা। নাসিম ভাই কিছুই জানে না।'

'তুই শুয়ে থাক বিছানায় আমি তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দি।'

ইলা বাধ্য মেয়ের মত শুয়ে পড়ল। তিনি মেয়ের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে ক্ষীণ গলায় বললেন, তুই আমাকে বললি কেন? তুই নিজে কেন তোর কথা তাকে বললি না।

'আমার লজ্জা লাগল। আমার মনে হচ্ছিল — আমার কথা শুনে উনি হো-হো করে হেসে ফেলবেন। সবার সামনে আমাকে ক্ষ্যাপাবেন।'

ইলা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। সুরমা বললেন, কাঁদিস না — যা বলার আমি বলব।

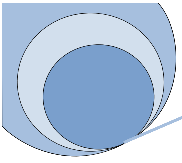
'কবে বলবে?'

'কালই বলব।'

'নাসিম ভাইকে বলবে?'

'না তাকে প্রথমে বলব না। আগে তার বাবার সঙ্গে কথা বলব। তুই কাঁদিস না।'

ইলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে না। তুমি তাকেই বল।



'আচ্ছা বলব। নাসিমকেই বলব।'

'তুমি এত ভাল কেন মা?'

মা হিসেবে যা করার তিনি করেছেন। ইলার মাথা থেকে ভূত দূর করেছেন। তিনি যা করেছেন যে কোন মা তাই করবে। তিনি তাঁর মেয়ের সাময়িক আবেগের দিকে তাকান নি। মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর সূক্ষ্ম কৌশল মেয়ে ধরতে পারে নি। জামানের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হবার পর সে আপত্তি করে নি। বিয়ে করেছে।

এখন মনে হচ্ছে ইলা তাঁর সূক্ষ্ম চাল ধরে ফেলেছে। ধরে ফেলারই কথা। ইলা বোকা মেয়ে নয়। বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে এখন যে কষ্ট পাচ্ছে তা সাময়িক কষ্ট। স্বামীর সংসারে এক সময় মন বসে যাবে। ছেলেমেয়ে হবে। পুরানো কথা কিছুই মনে থাকবে না।

সুরমা যে কাজটি করেছিলেন তাঁর জন্যে তাঁর মনে কোন অপরাধ বোধও নেই। তিনি এমন কোন অন্যায় করেন নি। এক সন্ধ্যায় নাসিমকে গোপনে ডেকে এনে বলেছিলেন — বাবা তোমার কাছে আমি একটা অনুরোধ করব। তুমি কি রাখবে?

নাসিম হকচকিয়ে গিয়ে বলেছে — অবশ্যই রাখব খালা। আপনি একটা কথা বলবেন আমি রাখব না। তা কি করে হয়!

'আমি তোমার কাছে হাত জোড় করছি বাবা।'

'ছিঃ ছিঃ খালা — কি করছেন আপনি!'

নাসিম এসে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করল। সুরমা বললেন, তুমি কি ইলাকে ডেকে একটু বলবে যে তুমি তাকে ছোটবোনের মত দেখ।

'তাই তো দেখি খালা।'

'আমি জানি বলেই বলছি। তুমি তাকে বল — ইলাকে তুমি ছোটবোনের মতই স্নেহ কর। তুমি চাও তার একটা ভাল বিয়ে হোক।'

'তা তো খালা আমি সব সময় চাই। এরকম ভাল একটা মেয়ে তার একটা ভাল বিয়ে–তো হবেই হবে। ইলার মত সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে খুব কম আছে। চার পাঁচটার বেশি না।'

'তাহলে বাবা তুমি ইলাকে একটু বল।'

'এটা বলার দরকার কি?'

সুরমা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, বলার দরকার আছে। তার ধারণা তুমি তাকে অন্য চোখে দেখ। এই ভেবে সে হয়ত মনে কষ্ট পায়।

নাসিম ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সুরমা বললেন, এই সব কথা তাকে বলার দরকার

নেই। তুমি শুধু বল যে তুমি তাকে ছোটবোনের মত দেখ।

'খালা আমি আজই বলব। ইলা গেছে কোথায়?'

বাবুর সঙ্গে কোথায় যেন গেছে। তিন ভাইবোন মিলে গেছে। তুমি বরং চলে যাও। অন্য একদিন এসে বলো।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আর শোন বাবা। তুমি নিজেও এখন একটা বিয়ে-টিয়ে কর। আমরা দেখি।'

'করব খালা। একটু সামলে-সুমলে উঠি তারপর। খালা আজ যাই।'

সুরমা যা করেছেন নিজের মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই করেছেন। আজ সে তা বুঝতে পারছে না। একদিন পারবে। আজ সে তার মা'কে ক্ষমা করতে পারছে না। একদিন অবশ্যই পারবে।

সুরমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন ইলা চলে গেছে। কিছু বলেও যায় নি। তিনি চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। রুবা রিকশা করে ফিরছে। মা'কে দেখে সে খুব হাত নাড়ছে। রুবার হাতে লাল রঙের বিরাট এক বেলুন।

ইলাদের বাসার সামনের রাস্তাটা আজ অন্ধকার। আবারো বোধহয় ঢিল ছুঁড়ে স্ট্রিট ল্যাম্প ভাঙা হয়েছে। আকাশ মেঘলা বলেই চারদিক অন্ধকার। রিকশা থেকে নেমেই ইলা তাদের ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল। ফ্ল্যাটের সবগুলি বাতি জ্বলছে। ইলার বুক ধকধক করা শুরু হয়েছে। ফ্ল্যাটের সব আলো জ্বলার অর্থ একটাই — জামান আজ সকাল সকাল ফিরেছে। তার কাছে চাবি আছে, ঘরে ঢুকেছে তালা খুলে। কতক্ষণ আগে সে এসেছে জানতে পারলে ভাল হত। হাসানকে জিজ্ঞেস করে গেলে হয়।

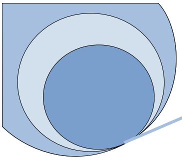
ইলা রিকশা ভাড়া দিল। ভয়ে ভয়ে সে এগুচ্ছে। তার হাত-পা কাঁপছে। এটা নিশ্চয়ই ভয়ংকর কোন অসুখের পূর্ব লক্ষণ। নয়ত সে এত ভয় পাবে কেন?

'ভাবী?'

ইলা চমকে উঠল। সিঁড়ির মুখে অন্ধকারে মিশে হাসান দাঁড়িয়ে আছে। নীল শার্টের ছেঁড়াটা হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। বেচারার জন্যে শার্টটা কেনা হয় নি। কাল একবার যেতে হবে।

'ভাবী একটা খারাপ খবর আছে।'

ইলা দাঁড়িয়ে আছে। হাসান তাকে কি খারাপ খবর দিতে পারে সে বুঝতে পারছে না।



'কি খবর?'

'অন্তুর শরীর খুবই খারাপ।'

'সে কি?'

'ডাক্তার বলছেন — বাঁচবে না। ঠোঁটের ঘা থেকে নানান সব সমস্যা হয়েছে। আজ বিকেলে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে চিনতে পারল না। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।'

'কি বলছ এসব?'

'ভাবী আমার মনটা খুব খারাপ হয়েছে। ছেলেটা এদিক-ওদিক কাকে যেন শুধু খুঁজে। বোধহয় আপনাকে খুঁজে। আপনি কি যাবেন?'

'হ্যাঁ যাব।'

'ভাইজান এসেছেন। ভাইজানকে বললাম, উনি চান না যে আপনি যান।'

'তুমি এখানে থাক আমি তোমার ভাইজানের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

দরজা খোলাই ছিল। ইলা ঘরে ঢুকে দেখে জামান চা খাচ্ছে। নিজেই বানিয়েছে। শুধু চা না। পিরিচে বিসকিট আছে। ইলা সহজ গলায় বলল, কখন এসেছ?

জামান চা খেতে খেতে বলল, দুপুরে।

ইলা নিজ থেকেই বলল, আজ দুপুরে চলে আসবে তা তো বলে যাও নি। বলে গেলে ঘরে থাকতাম। দুপুরে খেয়েছ?

'হুঁ।'

'কোথায় খেয়েছ? বাসায় না বাইরে?'

'বাইরে।'

'ঘরে খাবার তৈরি ছিল। ফ্রীজে রেখে দিয়েছিলাম।'

জামান কিছু বলল না। সে নিঃশব্দে চা খাচ্ছে। সে যে ইলার উপর খুব রেগে আছে তা মনে হচ্ছে না। ইলা বলল, অন্তুর শরীর খুব খারাপ তা-কি তোমাকে হাসান বলেছে?

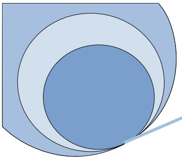
'হ্যাঁ বলেছে।'

'আমি ওকে একটু দেখে আসব। হাসান নিচে আছে ও আমাকে নিয়ে যাবে।'

'বস আমরা সামনে।'

ইলা বসল। জামান চায়ের কাপ নামিয়ে শান্ত গলায় বলল, দেখতে যাবার কোন দরকার নেই। যদি সত্যি সত্যি মরে যায় নানান যন্ত্রণা হবে। ডেডবডি নিয়ে সমস্যা হবে। পত্রপত্রিকায় লেখা হবে। কি দরকার।

'আমি বাচ্চাটাকে দেখতে যাব না?'



'না। খাল কেটে কুমীর আনতে হবে না।'

ইলা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। জামান তার বিস্মিত দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, আর তুমি যদি মনে কর আমার চড় খেয়ে অন্তু মারা যাচ্ছে সেটাও ভুল কথা। চড় তাঁকে ঠিকই মেরেছিলাম। পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে ফেলেছে সেটাও সত্যি। সামান্য ঠোঁট কাটা থেকে কেউ মরে যায় না। নানান অসুখ-বিসুখ এই ছেলের আগেই ছিল।

'তোমার এতটুকুও খারাপ লাগছে না?'

'লাগছে না কেন লাগছে। খারাপ লাগাটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না। প্রশ্রয় দিলে যে যন্ত্রণা হবে তা সামাল দেয়া যাবে না। পেছনের ফ্ল্যাটের ব্যাপারটাই ধর। তিনটা ছেলে ঐ বাড়িতে ঢুকল। ছেলে তিনটাকে সবাই চেনে। কেউ কি বলেছে তাদের কথা? কেউ বলে নি। বলবেও না।'

'তুমি কি বলছ কিছু বুঝতে পারছি না। ছেলে তিনটাকে সবাই চেনে মানে কি?'

'সবাই চেনে মানে সবাই চেনে। পালের গোদা আমাদের বাড়িওয়ালার ছেলে।'

'তোমাকে কে বলেছে?'

জামান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আমি জানি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে হাসানকে জিজ্ঞেস কর। জিজ্ঞেস না করাই ভাল। আমরা খোঁজখবর করছি এটা প্রচার হলেও অসুবিধা। আসল কথা হচ্ছে —— চুপচাপ থাকতে হবে। সব সময় পর্দার আড়ালে থাকতে হবে। কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে। অন্তুর মরে যাওয়াটা দুঃখের ব্যাপার, কিন্তু আগ বাড়িয়ে ভালবাসা দেখাতে গেলে হবে ভয়াবহ ব্যাপার।

'তুমি আমাকে যেতে দেবে না?'

'না।'

'ঠিক আছে যাব না। আমি হাসানকে বলে আসি যে যেতে পারব না। ও গিয়ে দেখে আসুক।'

'তুমি থাক। আমি বলে আসছি — ওরও যাবার দরকার নেই।'

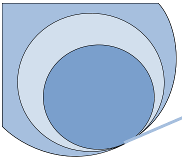
জামান শার্ট গায়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। ইলার নিজের শরীর খুব খারাপ লাগছে। গা গুলাচ্ছে। বমি আসছে। ইলা বেসিনের কাছে গিয়ে মুখ ভর্তি করে বমি করল।

জামান হাসানকে ডেকে রাস্তার কাছে নিয়ে গেছে। কথা বলছে নিচু গলায়।

'কেমন আছ হাসান?'

'জ্বি ভাল।'

'তুমি অন্তুর ব্যাপারে আর খোঁজখবর করবে না।'



'জ্বি আচ্ছা।'

'ছেলেটা মরে গেলে সবার যন্ত্রণা। তোমারও যন্ত্রণা।'

'জ্বি।'

'তুমি কি ইলার কাছে প্রায়ই যাও?'

'ভাবী ডাকলে যাই। টুকটাক কাজ করে দি।'

'এখন থেকে ডাকলেও যাবে না। ইলার এমন কিছু কাজ নেই যে তোমাকে করে দিতে হবে। যখন–তখন তার কাছে গেলে লোকজন নানান কথা বলতে পারে। টাকাটা রাখ আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাও। ভাংতি ফেরত দেয়ার দরকার নেই।'

'জ্বি আচ্ছা।'

জামান দাঁড়িয়ে আছে। হাসান সিগারেট আনতে যাচ্ছে। হাঁটছে মাথা নিচু করে। জামানের মনে হল এই ছেলের জন্মই হয়েছে মাথা নিচু করে থাকার জন্যে।

৭

....

বাবু দাড়ি শেভ করতে বসেছে।

ব্লেডটা পুরানো কাজেই গালে সাবান লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে। দাড়িগুলিকে নরম হবার সময় দিতে হবে। সে তাই করছে। সাবান লাগিয়ে বসে আছে। রুবা দাঁত মাজতে মাজতে ভাইকে লক্ষ্য করছে।

'কতক্ষণ বসে থাকবে ভাইয়া?'

'এই কিছুক্ষণ। দাড়ি নরম হোক।'

'কি বিরাট যন্ত্রণা তোমাদের, তাই না ভাইয়া?'

'হুঁ।'

'বিশেষ করে তোমার মত যাদের টাকা-পয়সা কম তাদের আরো বেশি যন্ত্রণা। এক ব্লেড যাদের এক মাস ব্যবহার করতে হয়।'

বাবু জবাব দিল না। আয়না হাঁটুর উপর রেখে ব্লেড হাতে নিল। রুবা তখন খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নতুন কেনা ঝকঝকে শেভিং বাক্স তার সামনে এনে রাখল। বাবু অবাক হয়ে বলল, ব্যাপার কি? টাকা কোথায় পেলি?

'যেখান থেকেই পাই তাতে তোমার কি। দাও ব্লেড ভরে দেই। জিনিসটা সুন্দর না ভাইয়া? এই দেখ সঙ্গে ব্রাশও আছে।'

বাবু বিস্মিত হয়ে বলল, এতো দামী জিনিসরে।

'হুঁ দামী। দু'শ পঁচিশ টাকা পড়েছে।'

'বলিস কি?'

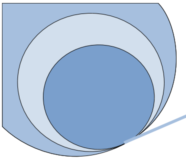
'আপা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছে, ঐ টাকায় কিনলাম। হা করে তাকিয়ে থাকবে না তো। দাড়ি কাটতে শুরু কর আমি দেখি।'

'টাকা নষ্ট করলি? সংসারে দিলে কাজে লাগত। এতগুলি টাকা। এটা এখন ফেরত দিলে ফেরত নেবে না?'

'না নেবে না।'

'টাকাটা পানিতে ফেললি রুবা।'

'মোটেই পানিতে ফেলি নি। তুমি মুখটা ফেনায় ফেনায় ভর্তি কর তো ভাইয়া, আমি দেখি।'



বাবু লজ্জিত মুখে ব্রাশ ঘসছে। শেভ করতে তার কেন জানি লজ্জা লজ্জা লাগছে। রেজার টানতেই গাল খানিকটা কেটে গেলে। ধবধবে সাদা ফেনার লাল রক্ত। রুবা তাকিয়ে আছে। বাবু বিব্রত মুখে বলল, বড়লোকি জিনিসে অভ্যাস নেই। এই দেখ গাল কেটে ফেলেছি।

রুবা ভাইয়ের পাশে বসল। গলা নিচু করে বলল, ভাইয়া তুমি আপাকে একদিন গিয়ে দেখে আস না কেন? তাদের নতুন ফ্ল্যাটে তুমি একদিনও যাও নি।

'ইলা কি কিছু বলেছে?'

'না বলে নি। আপা কোনদিন কিছু বলবেও না। না গেলে কষ্ট পাবে — এই পর্যন্তই।'

'যাব। একদিন যাব। খালি হাতে তো যাওয়া যায় না। হাতেও টাকা-পয়সা নেই। একসের মিষ্টি তো অন্তত নিয়ে যাওয়া উচিত।'

একসের মিষ্টির দাম আমি তোমাকে দেব।'

'বলিস কি!'

'আমার কাছে টাকা আছে। ইলা আপা পাঁচশ' টাকা দিয়েছে।'

'এত টাকা সে পেল কোথায়?'

'দুলাভাই দিয়েছে। এ ছাড়া আর কোথায় পাবে?'

বাবুর গাল আবার খানিকটা কেটেছে। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। এতগুলি টাকা বোনকে দিয়ে দিল, জামান জানতে পারলে অশান্তি করবে। লোকটা টাকা-পয়সার ব্যাপারে খুব কৃপণ। জামানকে না জানিয়ে ইলার উচিত নয় এত টাকা এদিক-ওদিক করা। পাঁচশ' টাকা অনেক টাকা, জামানের স্বভাব ভাল না। জামানের স্বভাব যে খারাপ তা বাবু ইলার বিয়ের এক সপ্তাহ পরই টের পেয়েছে। বোনকে দেখতে গিয়েছিল। ভেবেছিল যাবে আর দেখা করে চলে আসবে। ইলা কিছুতেই আসতে দেবে না। কেঁদে-টেদে এককাণ্ড — খেয়ে আসতে হবে।

খাবার টেবিলে জামান বলল, ভাইসাহেব আপনার ব্যবসা কেমন চলছে?

'চলছে। ক্যাপিটেলের অভাব। ক্যাপিটেল ছাড়া সবই আছে। ছোটখাট একটা অর্ডার পেয়েছি। ক্যাপিটাল জোগাড় না হলে অর্ডার নিতে পারব না। হাজার দশেক টাকার মামলা।'

জামান সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার হাত তো একদম খালি। আপনাকে তো দিতে পারব না।

বাবু বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি কেন দেবেন? আপনার কাছে তো টাকা চাই

নি।

'চাইতে হবে কেন? আমার তো নিজ থেকেই দেয়া উচিত। সম্ভব হচ্ছে না — হাত একেবারে খালি। ধার-দেনা করে বিয়ে!'

বাবুর গলায় খাবার আটকে যেতে লাগল। কিছুই মুখে রুচছে না। অল্প সময়ে প্রচুর আয়োজন করেছে ইলা। পোলাও করেছে। রোস্ট করেছে। না খেলে কষ্ট পাবে।

জামান বিরক্ত গলায় বলল, গরমের মধ্যে পোলাও কেন? প্লেন ভাত করতে পারলে না? আর তিনজন মানুষ আমরা, এত কি রান্না করেছ? পঞ্চাশজন লোক এ দিয়ে খাওয়ান যায়। এমন অপচয় মানুষ করে?

ইলা অসম্ভব লজ্জা পেয়েছিল। তার ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল। খাবার সময়টাতে সে আর সামনে থাকে নি। হয়ত বাথরুমে দরজা বন্ধ করে কেঁদেছে।

রুবা এখনো হা করে বাবুর দাড়ি শেভ করা দেখছে। সে ব্যাপারটায় খুব মজা পাচ্ছে। বাবু বলল, ইলাকে কেমন দেখে এলি?

'ভালই দেখলাম।'

'কথায় বার্তায় কি মনে হয় সে সুখী?'

'সুখী অসুখী কি আর কথায়বার্তায় বোঝা যায়?'

'তা ঠিক বোঝা যায় না। যেমন আমার কথাই ধর। আমাকে দেখে সবাই মনে করে অসুখী। আমি কিন্তু আসলে সুখী, বেশ সুখী।'

'তুমি এবং নাসিম ভাই তোমরা দু'জনেই যে সুখী তা কিন্তু তোমাদের মুখ দেখে বোঝা যায়। শুধু সুখী না — মহা সুখী। তোমরা কি ঐ বিলটা পেয়েছ ভাইয়া?'

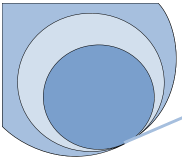
'না।'

'পাবে না?'

'বুঝতে পরাছি না। নাসিম অবশ্যি আশা ছাড়ে নি। এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন চেষ্টা হচ্ছে আধ্যাত্মিক লাইনে। রোজ সন্ধ্যায় এক পীর সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে বসে থাকে।'

বাবু শব্দ করে হেসে ফেলল। রুবাও হাসতে লাগল।

সুরমা রান্নাঘর থেকে অনেকক্ষণ থেকেই দেখছেন ভাই-বোন বারান্দায় বসে গুনগুন করছে। হাসাহাসি করছে। দু'জনের খুব খাতির। ইলা যখন আসে তখন তিনজন মিলে গুনগুন করে। তিনি কাছে গেলে তাদের গুনগুনানি থেমে যায়। তারা অবশ্যি বলে — এস মা। বস। তিনি প্রায়ই বসেন তখন তাদের কথাবার্তা আর



জমে না। এদের সংসারে তিনি যেন আলাদা মানুষ।

আজো দু'জন বসে গুনগুন করছে। তিনি পাশে গেলেই থেমে যাবে। সুরমা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলেন। বিরক্ত গলায় বললেন — তোরা সারাদিন বারান্দায় বসে থাকবি? নাশতা নিয়ে বসে থাকা ছাড়া আমার অন্য কাজ নেই?

রুবা বলল — তুমি যাও মা আমরা আসছি। সুরমা চলে এলেন। দুঃখে তাঁর চোখে পানি এসে যাচ্ছে। কি রকম কথা — তুমি যাও মা। তিনি যেন কাছেও থাকতে পারেন না। আশেপাশে থাকলেও দোষ।

বাবুর গাল আরেক জায়গায় কেটেছে। রুবা বলল, গালটা কি অবস্থা করেছ ভাইয়া। মোরব্বা বানিয়ে ফেলছ।

'তাই তো দেখছি। তোর এই জিনিস আমার পোষাচ্ছে না রে। আমাকে মনে হয় আগের জিনিসে ফিরে যেতে হবে। বরং একটা ক্ষুর কিনে নেব।'

'আমারো তাই মনে হচ্ছে ভাইয়া।'

এই বলেই রুবা হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে বলল — আচ্ছা ভাইয়া, তুমি কি জান আপা নাসিম ভাইকে বিয়ে করতে চেয়েছিল?

'জানি।'

'কিভাবে জান? কে বলেছে তোমাকে?'

'কেউ বলে নি। অনুমান করেছি।'

'আমি পুরো ব্যাপারটা জানি। আমারটা কিন্তু অনুমান না।'

রুবা গলার স্বর আরো নিচু করে বলল, যে রাতে আপা মা'কে ঘুম থেকে তুলে বলল, আমি সেই রাতেই জানি। আমি আসলে একজন স্পাই টাইপের মেয়ে। মাঝ–রাতে আপা বিছানা ছেড়ে উঠে গেল। আমি তার পেছনে পেছনে চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলাম কথাবার্তা।

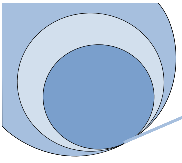
'কাজটা কি ঠিক হল রুবা?'

'ঠিক হয় নি। আমি তো ভাইয়া তোমার বা আপার মত ভাল মানুষ না। আমি খারাপ মানুষ। কে কি করছে, কে কি ভাবছে — এইসব আমি ধরতে চেষ্টা করি।'

'আর করিস না।'

'আচ্ছা আর করব না।'

রুবা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপার সঙ্গে নাসিম ভাইয়ের বিয়ে হলে খুব চমৎকার হত। মানুষ হিসেবে দু'জনই অসাধারণ। আমি আমার জীবনে আপার মত ভাল মেয়ে যেমন দেখি নি, নাসিম ভাইয়ের মত ভাল ছেলেও দেখি নি। এই দু'জন মানুষকে যে আমি কি পছন্দ করি তা তোমরা বুঝতেও পারবে না। ঐদিন কথায়



কথায় নাসিম ভাই বলল, একটা মেয়েকে তার খুব ভাল লেগেছে — শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি এসে গেছে।

বাবু দাড়ি শেভ করা বন্ধ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রুবা ভাইয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শান্ত গলায় বলল, তুমি কেন এ রকম করে তাকিয়ে আছ তা আমি বুঝতে পারছি ভাইয়া। তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু না।

'আমি কি ভাবছি?'

'তুমি ভাবছ — রুবারও কি ইলার মত সমস্যা হল? না, তা হয় নি।'

'শুনে ভাল লাগল।'

বাবু হাসল। রুবাও হাসল।

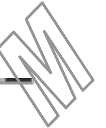
সুরমা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। লক্ষ্য করলেন তাঁকে দেখেই দুই ভাই-বোন হাসি বন্ধ করে দিয়েছে। কেন তারা এরকম করে। তারা মনে করার চেষ্টা করে না — তাদের বাবা মারা যাবার পর এই সংসার তিনি একা টেনে তুলেছেন। প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন বাবার অভাব যেন এরা বুঝতে না পারে।

এক সময় ছেলেমেয়ের কাছে তাঁর প্রয়োজন ছিল। আজ নেই। আজ তিনি এদের বিরক্তির কারণ।

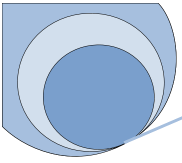
রুবা বলল, দাঁড়িয়ে আছ কেন মা? কিছু বলবে?

'না।'

'তাহলে দয়া করে অন্য কোথাও যাও তো মা। তুমি যেভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছ তাতে মনে হচ্ছে অভিশাপ দিচ্ছ।'



সুরমা ক্লান্ত গলায় বললেন, অভিশাপ দিচ্ছি না। আর অভিশাপ দিলেও — মা'র অভিশাপ ছেলেমেয়েদের স্পর্শ করে না।



৮

কলিং বেল টিপে নাসিম অপেক্ষা করছে। তার হাতে কুড়িটা রজনীগন্ধার স্টিক। ফুলগুলি থেকে সে কোন গন্ধ পাচ্ছে না। গন্ধহীন রজনীগন্ধা! তার কাছে মনে হচ্ছে — ফুলের মধ্যে কোন ভেজাল আছে। সব কিছুতেই ভেজাল। এ বাড়ির কলিং বেলেও ভেজাল আছে মনে হয়। তিনবার টেপা হল। কেউ আসছে না। শব্দই হয়ত হচ্ছে না। দরজা ধাক্কাধাক্কি করাটা যুক্তিসঙ্গত নয়। এ বাড়িতে আজ নিয়ে তার দ্বিতীয় দফার আসা। প্রথমবার কাতল মাছ নিয়ে এসেছিল। আজ রজনীগন্ধা। নাসিম 'বিসমিল্লাহ' বলে আরেকবার কলিং বেল টিপল। এবারে দরজা খুলল। বুড়ো একজন লোক দরজা খুললেন। সব বুড়ো মানুষ অসুখী অসুখী চেহারা করে রাখেন — এঁর চেহারা সুখী সুখী। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। হাতে ইংরেজী গল্পের বই। মনে হচ্ছে জীবনের শেষ অংশটা তাঁর আনন্দে কাটছে।

'কাকে চান?'

'মিসেস মেহেরুন্নেসাকে একটু প্রয়োজন ছিল।'

'মিসেস মেহেরুন্নেসাটা কে?'

'ডাকনাম সম্ভবত তুহিন।'

'তুহিন ডাকনামের কেউ এ বাড়িতে নেই।'

নাসিম ধাঁধায় পড়ে গেল। এর আগের বার তুহিন নামটা সে শুনেছে। ডাকনাম ঘনঘন বদলাবার নিয়ম আছে কি?

'আমি রহমান সাহেবের মেয়ের কাছে এসেছিলাম।'

'ও, মেঝো বৌমা? মাহীনকে চাও?'

'জ্বি।'

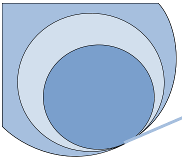
'তুমি কে?'

'নাম বললে আমাকে উনি চিনবেন না। আমার নাম নাসিম। বন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড থেকে এসেছি।'

'তুমি বোস। বৌমা খোকাকে খাওয়াচ্ছে।'

'আমার কোন তাড়াহুড়া নেই, আমি বসছি।'

বুড়ো ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন। নাসিম স্বস্তি পেল। মাহীনের আসতে দেরি হলেই ভাল। কিছুক্ষণ ঠাণ্ডামাথায় চিন্তা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। কথাগুলি



কিভাবে বলতে হবে প্রাকটিস করে নেয়া। প্রথম কথা যা বলবে তা হচ্ছে — আপা আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? আরেকদিন এসেছিলাম। আমি বন এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের নাসিম। আপনাকে একটা কার্ড দিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের একটা বিলের ব্যাপারে। বিলটা আপনার বাবার কাছে আটকে আছে। আপা, আপনার কি মনে পড়েছে? আপনি বলেছিলেন সব ঠিকঠাক করে দেবেন। খুব সমস্যার মধ্যে আছি। লোকজনদের কাছ থেকে ধারটার নিয়ে কাজটা করেছি ওরা এখন আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবার মতলব করেছে। সবচে' বেশি সমস্যা করছে আমার নিজের বোন . . .

চিন্তার সময় তেমন পাওয়া গেল না। পর্দা ঠেলে মাহীন ঢুকল। নাসিমকে দেখে তার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল। নাসিম তার সাজিয়ে রাখা কথা একটাও বলতে পারল না। মাহীন তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আপনার সাহস তো কম না। আপনি আবার এসেছেন?

নাসিম হকচকিয়ে গেল। এ জাতীয় আক্রমণ তার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। মাহীন বলল, আপনার কথা শুনে ঐদিনই বাবার কাছে গিয়েছিলাম। বাবা আকাশ থেকে পড়েছেন। বাবা অনেক ঝামেলা করে আপনাদের কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন। আর এইভাবে তাঁর নামে আজেবাজে কথা ছড়িয়ে আপনি তার প্রতিদান দিচ্ছেন? এত সাহস আপনার?

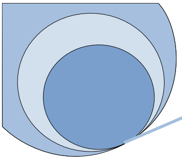
হৈচৈ শুনে বুড়ো ভদ্রলোক আবার ঢুকলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন, কি হয়েছে বৌমা? মাহীন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, দেখুন না বাবা, এই লোক আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছে। বাবার নামে আজেবাজে কথা আমার কাছে বলছে।

বুড়ো তীক্ষ্ণ গলায় বলল — কি চাও হে ছোকরা? কি ভেবেছ? মতলবটা কি? পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করে দেব? বৌমা লালবাগ থানার নাম্বারটা কত বল তো?

অতি দুঃখেও নাসিমের হাসি পেল। বুড়ো একজন মানুষের ভয় দেখানোর একি ছেলেমানুষি চেষ্টা — 'বৌমা লালবাগ থানার নাম্বারটা কত বল তো?' ভাবটা এরকম যে তাদের আদরের বৌমা অবসর সময়ে সব থানার নম্বর মুখস্থ করে বসে থাকে। এটাই হচ্ছে আদরের বৌমার হবি।

নাসিম মিষ্টি করে হাসল। হাসিতে যদি কাজ হয়। কাজ হল না। বুড়ো আরো রেগে গেল।

'ছোকরা তোমার গায়ের চর্বি পানি বানিয়ে ছাড়ব। বৌমা লালবাগ থানার ওসিকে টেলিফোনে ধর। বল — খায়রুল ইসলাম কথা বলবেন।'



নাসিম বলল, স্যার আপনি বেশি রেগে গেছেন। এই বয়সে বেশি রেগে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। স্ট্রোক এখন ডালভাত হয়ে গেছে। বিশেষ করে আপনার মত দুধ ঘি খাওয়া মানুষদের জন্যে তো রাগ করা খুবই রিস্কি।

'শাট আপ — ইউ স্কাউনড্রেল।'

'আমি তো 'শাট আপ' করেই আছি। চিৎকার যা করার তো আপনিই করছেন।'

'সান অব এ বিচ বলে কি? বৌমা টেলিফোনটা দেখি।'

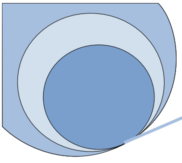
নাসিম হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, মাহীন তুমি বুড়োমিয়াকে টেলিফোনটা দাও। বুড়োমিয়া কোথায় টেলিফোন করতে চায় করুক। আর শুনুন বুড়ো মিয়া, আমি একা এখানে আসি নি। দলবল নিয়ে এসেছি। ওরা নিচে অপেক্ষা করছে। মালমসলা নিয়ে অপেক্ষা করছে। হৈচৈ শুনলে উপরে চলে আসতে পারে। উপরে চলে এলে আপনাদের সামান্য অসুবিধা হতে পারে।

বুড়ো এবং তার বৌমা দু'জনের মুখই শুকিয়ে গেল। নাসিম পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে খুব স্বাভাবিক গলায় — যেন ঘরোয়া আলাপ করছে এমন ভঙ্গিতে বলল, মাহীন শোন, তোমাকে এবং তোমার বাবাকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। এখন বাজে এগারটা পঁয়ত্রিশ। বুধবার এগারটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে আমাদের অফিসে টাকা-পয়সা পৌঁছে দিতে হবে। এটা তুমি তোমার বাবাকে বলবে। আমি এম্নিতে অত্যন্ত মধুর স্বভাবের মানুষ আশা করি — ইতিমধ্যে তা বুঝতে পেরেছ। কিন্তু বুধবার এগারটা পঁয়ত্রিশের পর মধুর স্বভাব নাও থাকতে পারে। চলি, কেমন? বুড়ো মিয়া চলি? আমার সঙ্গে তিনটা জর্দার কৌটা আছে। ব্যবহার করলাম না। যদিও আপনার ব্যবহারে বেশ বিরক্ত হয়েছি। আজকের মত বিদায় হচ্ছি। ও মাহীন ভাল কথা, এই রজনীগন্ধাগুলি তোমার জন্যে এনেছিলাম। রেখে দাও। এগুলি দেখতে আসলের মত হলেও আসল না। গন্ধবিহীন রজনীগন্ধা। এর ডাঁটাগুলি তরকারী হিসেবে খাওয়া যায়। ঝাল ঝাল করে রান্না করতে হবে। চেষ্টা করে দেখতে পার।

নাসিম মুখ ভর্তি করে ধোঁয়া ছাড়ল। মধুর ভঙ্গিতে হেসে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কয়েকবার শিস দেবারও চেষ্টা করল। পেছন থেকে কেউ কোন শব্দ করল না।

নাসিম বলেছিল নিচে তার দলবল আছে। দলবল বলতে বাবু একা। সে রাস্তার পাশের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তিত মুখে চা খাচ্ছিল, নাসিমকে দেখে চায়ের কাপ রেখে এগিয়ে এল।

'কিছু হয়েছে?'



'না। ভয় দেখিয়ে এসেছি।'

'সে কি — কি ভয় দেখালি?'

'কোন টেকনিকই যখন কাজ করছে না — ভয় টেকনিকটা ট্রাই করলাম।'

বাবু চিন্তিত মুখে বলল, আমার মনে হচ্ছে তুই একটা ঝামেলা বাঁধিয়েছিস। টাকা উদ্ধারের আমি কোন আশা দেখছি না।

'টাকা ঠিকই উদ্ধার হবে, যে অসুখের যে অষুধ। বুধবারের আগেই দেখবি টাকা-পয়সা সব দিয়ে গেছে।'

'বুধবার কেন?'

'বুধবার পর্যন্ত ওদের সময় দিয়েছি। ফোর্টি এইট আওয়ার টাইম। ধর, সিগারেট নে। তুই মুখ এমন শুকনো করে রেখেছিস কেন? ভয় পাচ্ছিস না-কি? ভয়ের কিছু নেই।'

'আমার তো মনে হচ্ছে ভয়ের অনেক কিছুই আছে।'

'তোর মত ভিতুর ডিম নিয়ে কাজ করা মুশকিল। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ভিতুদের কোন স্থান নেই। বর্তমান কালটা হচ্ছে শক্তের। যে অন্যকে ভয় দেখাতে পারবে সেই টিকে থাকবে। অন্যরা পারবে না। তাদের স্থান হবে নর্দমায়।'

'কি বলে ওদের ভয় দেখালি?'

'কি কি বলেছি নিজেরো মনে নেই তবে বুড়ো এক লোক ছিল — তাঁর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। হাত থেকে বই পড়ে গেছে। মনে হয় লুঙ্গিও ভিজিয়ে ফেলেছে — হা হা হা। হো হো হো।'

'তুই হাসছিস? আমার কিন্তু ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কিছু নেই।'

'ভয়ের কিছু নেই' বাক্যটি বিকেল নাগাদ মিথ্যা প্রমাণিত হল। পুলিশ এসে বন এন্টারপ্রাইজের অফিস থেকে নাসিমকে ধরে নিয়ে গেল।

৯

হাসান খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, ইলা অন্তুর মৃত্যু সংবাদ খুব সহজভাবে গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে কোন রকম উত্তেজনা বা উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে না। হাসান ভেবেছিল ইলা জানতে চাইবে — কিভাবে মারা গেল? কখন মারা গেল? ইলা সেদিক দিয়ে গেল না। সে শুধু ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে রইল। জানতে চাইলে হাসান বিপদে পড়ত, কারণ সে নিজেও পুরোপুরি জানে না।

'ভাবী, ডেডবডি কি নিয়ে আসব?'

'না। তোমার ভাই চান না। তুমি তো এ বাসার ঠিকানা হাসপাতালে দিয়ে আস নি। তাই না?'

'জ্বি–না, আমি ভর্তি করাবার সময় শুধু লিখেছিলাম, ঝিকাতলা, ঢাকা। ওর অবস্থা খারাপ ছিল। এত কিছু লেখার সময় ছিল না।'

'ঠিকানা না দিয়ে ভালই করেছ। তোমার ভাই খুশি হয়েছে।'

'ডেডবডি কি হাসপাতালেই থাকবে?'

'থাকুক, তোমার ভাই বলেছে বেওয়ারিশ লাশের জন্যে ওদের অনেক ব্যবস্থা আছে।'

'ভাবী, আমি তাহলে যাই?'

'একটু দাঁড়াও। তোমার জন্যে আমি সামান্য একটা উপহার কিনেছি। দেখ তো তোমার পছন্দ হয় কি–না।'

ইলা শার্টের প্যাকেটটা হাসানের দিকে বাড়িয়ে দিল। হাসান অবাক হয়ে প্যাকেটটা নিল।

'আমি তো তোমার মাপ জানি না। অনুমানে কিনেছি। পরে দেখ হয় কি–না। না হলে বলবে, তোমাকে নিয়ে গিয়ে বদলে নিয়ে আসব।'

হাসান ধন্যবাদ–সূচক কিছু বলতে গেল, বলতে পারল না। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। আজ এই চমৎকার মেয়েটা এমন আচরণ করছে কেন?

ইলাকে আজ তার কাছে লাগছেও অন্য রকম। মুখ ফোলা ফোলা। চোখের নিচে কালি পড়েছে। হাসানের খুব ইচ্ছা করছে জিজ্ঞেস করে, আপনার কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করতে পারছে না।

'ভাবী যাই?'

'আচ্ছা যাও।'

হাসান গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। ইলা বলল, কিছু বলবে হাসান?

'জ্বি–না।'

'আমি তোমার চাকরির কথা তোমার ভাইকে কিছু বলি নি। ওকে বললে কোন লাভ হবে না। আমি অন্য একজনকে বলব। তাঁকে বললে কাজ হবে। যাকে বলব তাঁর ক্ষমতা খুবই সামান্য। তবু উনি কিছু–না–কিছু জোগাড় করে দেবেন।'

'কবে কথা বলবেন?'

'খুব শিগগিরই বলব।'

'আপনি বরং একটা চিঠি লিখে দিন। আমি হাতে হাতে দিয়ে আসব। আমি এখানে আর থাকতে পারছি না ভাবী।'

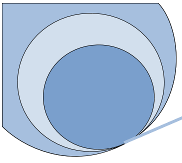
'আচ্ছা তুমি একটু ঘুরে আস। ঘন্টা খানিক পরে খোঁজ নিও। লিখে রাখব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

ইলা দরজা বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি নিয়ে বসল না। চোখে–মুখে খানিকটা পানি দিল। রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের পানি বসাল। চা খেতে ইচ্ছা করছে। চুলায় চায়ের পানি ফুটছে, সে গিয়ে অন্তুর বেতের স্যুটকেসটা খুলল। এই স্যুটকেসটা ইলার, সে অন্তুকে দিয়েছে। স্যুটকেস খুব সুন্দর করে গোছানো। যে সব জিনিস অন্তুর মনে ধরেছে সবই সে স্যুটকেসে তুলে রেখেছে। চায়ের একটা চামচ ভেঙে গিয়েছিল। চামচের সেই মাথা অতি যত্নে তুলে রাখা হয়েছে। জামানের জুতার ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। নতুন ফিতা কিনেছে। পুরানো ফিতা ফেলে দিয়েছিল। সেই ফেলে দেয়া ফিতাও স্যুটকেসে রাখা আছে। ইলা যে পাঁচ টাকার নোটটা দিয়েছিল সেটা একটা খামে ভরা। ইলা তার একটা ছবিও খুঁজে পেল। ছবির অর্ধেকটা ছেঁড়া। তার এবং জামানের পাশাপাশি বসে তোলা বিয়ের সময়কার ছবি। কোত্থেকে অন্তু পেয়েছে কে জানে। ছবির একটি অংশ সে নষ্ট করে ফেলেছে — প্রিয় অংশটি রেখে দিয়েছে।

ছেলেটার নিশ্চয়ই বাবা আছে, মা আছে, ভাইবোন আছে। মরবার সময় তাকে মরতে হয়েছে একদল অপরিচিত মানুষদের মধ্যে। ইলা পাশে থাকলে কি লাভ হত? সে কি বলতে পারত — অন্তুমিয়া শোন, এই পৃথিবী তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এই কষ্ট তোমার প্রাপ্য ছিল না। আমি পৃথিবীর পক্ষ থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। নাও, তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে থাক। পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় অতি প্রিয় একজন কাউকে জড়িয়ে ধরে থাকতে হয় —

ইলা স্যুটকেস বন্ধ করে উঠে গেল। চা বানাল। শান্ত ভঙ্গিতে চা খেয়ে চিঠি



লিখতে বসল। সে অনেক দিন ভেবেছে — নাসিম ভাইকে একটা চিঠি লিখবে। একটিই চিঠি। প্রথম এবং শেষ । সেই চিঠিটি আজই লেখা হোক।

ইলা নিজের স্যুটকেস খুলল। এখানে চিঠি লেখার জন্যে খুব দামী কাগজ আছে, খাম আছে। কলম আছে। কোনটাই কখনো ব্যবহার করা হয় নি। ইলা চিঠি শুরু করল খুব ঘরোয়া ভঙ্গিতে—

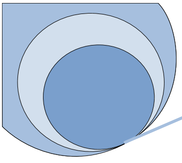
নাসিম ভাই,

আমার সালাম নিন। চিঠি দেখে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন। জরুরী কারণে লিখতে বাধ্য হচ্ছি —। যে ছেলেটা চিঠি নিয়ে আপনার কাছে যাচ্ছে, সে খুব সমস্যায় আছে। আপনি তার কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। এবং কোন একটা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। কিভাবে করবেন তা আমি জানি না। বুঝতে পারছি চিঠি এই পর্যন্ত পড়েই আপনি আমার উপর খুব রেগে গেছেন। চেঁচিয়ে বাবু ভাইকে বলছেন — ইলাটার যে মাথা খারাপ তা তো জানতাম না। আমার নিজের নেই ঠিক, আমি অন্যকে কি চাকরি দেব?

আমি জানি কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। তাছাড়া শুনলাম — আপনারা ভাতের হোটেল দিচ্ছেন। সেখানেও তার একটা ব্যবস্থা হতে পারে। সে না হয় বাজার থেকে চাল কিনে আনবে — আপনারা দুই বন্ধু সেই চাল ফুটিয়ে ভাত করবেন — সেই ভাত বিক্রি হবে। আপনি নিশ্চয়ই রাগ করছেন। আমি ঠাট্টা করছি। আপনার সঙ্গে তো মুখোমুখি আমি কখনো ঠাট্টা করি না। আজ করলাম। তা ছাড়া — এম্নিতে আপনাকে আমি তুমি করে বলি — চিঠিতে আপনি লিখছি। প্রভেদটা কি আপনার চোখে পড়েছে?

নাসিম ভাই আজ আমার খুব কষ্টের একটা দিন। আমার বাসার কাজের ছেলেটা মারা গেছে। ওর নাম অন্তু মিয়া। একদিন ভিক্ষা করতে এসেছিল, আমি ভাত-তরকারী খেতে দিয়ে বললাম, কাজ করবি অন্তু? সে হাসতে হাসতে বলল, জ্বে না। খেয়ে-দেয়ে চলে গেল। সন্ধ্যাবেলা একটা মাদুর নিয়ে উপস্থিত। সে থাকবে। ছেলেটা হাসপাতালে মারা গেছে। আমি তাকে দেখতেও যাই নি। আপনি হলে কি করতেন আমি জানি। হাসপাতালে ছোটাছুটি করে হৈ-চৈ করে একটা কাণ্ড ঘটাতেন। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর — শব্দ করে কাঁদতে শুরু করতেন। চারপাশে লোক জমে যেত।

ভাইয়া একবার খাঁচা ভর্তি মুনিয়া পাখি কিনে আনল। কয়েকদিন যেতেই একটা পাখি অসুস্থ হয়ে গেল। সে অন্য পাখিগুলি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। তার



পালক ফুলে গেল। সে একা একা মৃত্যুর জন্যে তৈরি হল। একটি পাখিও তাকে দেখতে আসে না। পাখিদের এই অদ্ভুত সাইকোলজিতে আমরা সবাই খুব মজা পেলাম। আপনাকে যখন বলা হল — আপনি মোটেই মজা পেলেন না। অসম্ভব দুঃখিত হলেন। অসুস্থ পাখিটাকে বাঁচাবার জন্যে আপনার সে কি চেষ্টা। দেশে পশু ডাক্তার আছে, পাখি ডাক্তার নেই বলে আপনার কি রাগারাগী। পাখিটা মারা গেল আপনার কোলে। আপনার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। রেগে অস্থির হয়ে ভাইয়াকে বললেন — গাধা তোকে কে পাখি কিনে আনতে বলেছে?

আপনি যে কি চমৎকার একজন মানুষ তা কি আপনি জানেন নাসিম ভাই? জানেন না। বাবু ভাইয়াও অসাধারণ একজন মানুষ। আপনাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখলে আমার কি যে ভাল লাগে।

আমি খুব সাধারণ একটি মেয়ে বলেই অসাধারণ মানুষদের অবাক হয়ে দেখি। আমি আপনাকে অবাক হয়ে দেখতাম। অসাধারণ মানুষদের স্বপ্নগুলিও খুব অসাধারণ হয়। কিন্তু আশ্চর্য আপনাদের দু'জনের স্বপ্নগুলি খুবই সাধারণ। ভাতের হোটেল দেয়াতেই স্বপ্নের শেষ। অথচ আমি কত সাধারণ একটা মেয়ে, কিন্তু অসাধারণ আমার স্বপ্ন। স্বপ্নটা কি আপনাকে বলি। আমি শহর থেকে অনেক দূরে বিরাট জায়গা জুড়ে একটা বাগান বাড়ি করব। সেই বাড়িতে থাকবে অসংখ্য ঘর। কিন্তু মানুষ মাত্র দু'জন। বাড়ির চারদিকে ঘন বন। পেছনে বিশাল এক পুকুর। পুকুর ভর্তি জলপদ্ম। জানি না জলপদ্মের ধারণা হঠাৎ কি করে আমার মাথায় এল। এমন না যে আমি খুব কাব্যিক স্বভাবের মানুষ। হয়ত ছোটবেলায় কোন একটা গল্পের বইয়ে জলপদ্মের কথা পড়েছিলাম। কিংবা কে জানে হয়ত বাবার কাছে জলপদ্মের গল্প শুনেছি। সেটাই মাথায় ঢুকে গেছে।

আপনার কি মনে আছে, আমি একদিন আপনাকে বললাম, নাসিম ভাই আমাকে একদিন জলপদ্ম দেখিয়ে আনবে? আপনি বিরক্ত হয়ে বললেন, জলপদ্ম আমি পাব কোথায়?

'বলধা গার্ডেনের পুকুরে আছে।'

'আমার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই তোকে নিয়ে বলধা গার্ডেনে ঘুরে বেড়াব। যা ভাগ।'

আমি কিন্তু ঘ্যানঘ্যান করতেই থাকলাম। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন। সেদিন বলধা গার্ডেন বন্ধ ছিল। আমরা ঢুকতে পারলাম না। আপনি বিরক্ত হয়ে বললেন, হল জলপদ্ম দেখা? চল এখন বাসায় ফিরি। দিনটা নষ্ট হল। এখন তো জায়গা চিনে গেলি। কাল একবার এসে দেখে যাস। ধর এই কুড়িটা টাকা রেখে দে

— রিক্সা ভাড়া।

নাসিম ভাই জলপদ্ম আমার দেখা হয় নি। জলপদ্ম আমি আপনার সঙ্গে দেখতে চেয়েছিলাম। কিছু কিছু জিনিস আছে একা দেখা যায় না। দু'জনে মিলে দেখতে হয়।

আজ আপনাকে এসব লেখা অর্থহীন। তবু লিখলাম। যদি অন্যায় করে থাকি ক্ষমা করবেন। আমি আমার জীবনে বলতে গেলে কোন অন্যায়ই করি নি। একটা না হয় করলাম। তাতে ক্ষতি যদি কারো হয় — আপনার হবে। আপনার খানিকটা ক্ষতি হলে, হোক না।

আমার বিয়ের দিন আপনি যখন বরযাত্রী খাওয়ানো নিয়ে খুব ব্যস্ত তখন আমি রুবাকে দিয়ে আপনাকে ডেকে পাঠালাম। আমি সেজেগুজে খাটে বসে আছি। আপনি ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে হকচকিয়ে গেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ডেকেছিস কেন?

'বিয়ে হয়ে চলে যাচ্ছি — আর তো দেখা হবে না। সালাম করবার জন্যে ডাকলাম।'

আমি আপনার পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। ঘর ভর্তি লোকজন। আপনি অপ্রস্তুত মুখে হাসছেন। আমি বললাম, নাসিম ভাই, তুমি এমন কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? মাথায় হাত দিয়ে দোয়া কর। না-কি আমি এতই খারাপ মেয়ে যে আমার মাথায় হাত দেয়া যাবে না?

আপনি আমার মাথায় হাত দিলেন। কি দোয়া করেছিলেন আপনি? প্রিয়জনদের দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না। এই পৃথিবীতে আপনার চেয়ে প্রিয়জন আমার কে আছে? আপনার দোয়া ব্যর্থ হল কেন বলুন তো?

দরজায় শব্দ হচ্ছে। ইলা দরজা খুলল। হাসান দাঁড়িয়ে আছে।

'চিঠিটা কি শেষ হয়েছে ভাবী?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে খামের উপর ঠিকানা লিখে দিন। আমি নিয়ে যাই।'

ইলা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চিঠি দেব না। আমি মুখেই বলব। তুমি চিন্তা করো না। একটা ব্যবস্থা হবেই।

'জ্বি আচ্ছা ভাবী।'

'আরেকটা কথা হাসান — আমাদের পেছনের বাড়ির ফ্ল্যাটে যে ছেলে তিনটা ঢুকেছিল — তাদের তুমি দেখেছ — তাই না?'

'জ্বি।'

'তাদের তুমি চেন। অন্তত একজনকে খুব ভাল করে চেন। চেন না?'

'জ্বি।'

'পুলিশকে বল নি কেন?'

'সাহস নাই ভাবী।'

'ইলা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, তোমাকে একটা মজার কথা বলি। ছেলে তিনটাকে আমিও দেখেছি। ঐদিন আমি পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওরাও আমাকে দেখেছে। ওরা ঐ বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে যায় নি। ওদের সঙ্গে টেলিভিশন সেট ছিল না।'

'জ্বি ভাবী আমি জানি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে হাসান। তুমি যাও। আমার মাথা ধরেছে — আমি শুয়ে থাকব।'

'আপনার কি শরীর খারাপ ভাবী?'

'একটু বোধহয় খারাপ।'

'ডাক্তার ডেকে আনব?'

'না ডাক্তার লাগবে না।'

ইলা দরজা বন্ধ করে চিঠির কাছে ফিরে এল। কয়েকটা লাইন বাকি আছে। সেই বাকি লাইনগুলি লিখতে ইচ্ছা করছে না। তার খুব খারাপ লাগছে। চিঠি কুচি কুচি করে ছিঁড়ল। ছেঁড়া টুকরোগুলি নিজের স্যুটকেসে রেখে ঘুমুতে গেল।

দুপুরে রান্না হয় নি। রান্না করতে ইচ্ছা করছে না। জামান বলে গেছে — আজ দুপুরে বাসায় খাবে তবু রান্নাঘরে যেতে ইচ্ছা করছে না। শরীরটা এত খারাপ লাগছে কেন?

ইলার ঘুম ভাঙল কলিং বেলের শব্দে। একটানা বেল বেজেই যাচ্ছে। বেজেই যাচ্ছে। ইলা উঠে গিয়ে দরজা খুলল — জামান দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ কঠিন। সে ইলার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে।

'অনেকক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছি। কি করছিলে?'

'ঘুমুচ্ছিলাম।'

'দুপুর বেলা ঘুমুচ্ছ?'

'আমার শরীরটা ভাল না। আমি আজ কিছু রাঁধি নি। তুমি হোটেল থেকে কিছু খেয়ে এস।'

'তোমার ভাই এসেছিল আমার কাছে। আমার অফিসে।'

'ও।'

'কি জন্যে এসেছিল জিজ্ঞেস করলে না?'

'কি জন্যে?'

'দু'হাজার টাকার জন্যে এসেছিল — পুলিশকে না-কি ঘুষ দিতে হবে। তার যে বন্ধু আছে নাসিম। বিজনেস পার্টনার। ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। এখন আছে লালবাগ থানা হাজতে। টাকা আমি তাকে দেই নি, কারণ আমার ধারণা তার কাছে টাকা আছে। না থাকলে কিছুদিন পরপর বোনকে টাকা দেয় কি করে? ঠিক না ইলা?'

'হ্যাঁ ঠিক।'

'নিচে হাসানের সঙ্গে দেখা হল। গায়ে নতুন শার্ট। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে বলল — তুমি কিনে দিয়েছ। শার্টটার কত দাম পড়ল?'

'তিন শ' একুশ।'

'এরকমই হবার কথা, বিদেশী জিনিস। ইলা, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'বল।'

'এখন না। এখন আমি বেরুব। জয়দেবপুর যাব। রাত এগারটার দিকে ফিরব। তখন কথা হবে।'

'আচ্ছা আমি হাসানকে বলব গেট খোলা রাখতে।'

'তুমি আমাকে বোকা ভাবলে কেন ইলা?'

'আমি কাউকে বোকা ভাবি না।'

'আমাকে ভেবেছ। তুমি ভেবেছ মানিব্যাগ চুরির ব্যাপারটা আমি কখনো ধরতে পারব না।'

দু'জন তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে। এক সময় জামান উঠে দাঁড়াল। ইলা বলল, আজ আমি যাত্রাবাড়িতে আমার মা'র কাছে যাব। আজ আমার বাবার মৃত্যু বার্ষিকী। আমি ফিরে আসব। রাত এগারটার আগে অবশ্যই ফিরে আসব।

জামান বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। জামানকে অবাক করে দিয়ে ইলাও তার দিকে তাকিয়ে হাসল। কেন জানি এই মানুষটাকে তার এখন আর ভয় করছে না।

১০

হাসান গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ইলাকে দেখে বলল, কোথায় যাচ্ছেন ভাবী?

ইলা হাসল। হাসান বলল, রিকশা ডেকে দেই?

'দাও। শার্টটায় তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে হাসান। খুব মানিয়েছে।'

হাসান মাটির দিকে তাকিয়ে হাসল। ইলা বলল, তুমি সব সময় এমন ছোট হয়ে থাক কেন?

'ছোট মানুষ ভাবী। এই জন্যেই ছোট হয়ে থাকি।'

'বড় মানুষ হবার চেষ্টা করলে কেমন হয়?'

'কিভাবে হব?'

'চেষ্টা করলেই পারবে। তোমার মত চমৎকার একটা ছেলে সারাজীবন মাথা নিচু করে থাকবে ভাবতেও খারাপ লাগে।'

'পরের আশ্রয়ে থাকি।'

'তা ঠিক। এই আমাকেই দেখ। পরের আশ্রয়ে আছি বলেই আমার নিজেরো মাথাটা নিচু। সারাক্ষণ ভয়ংকর আতংকের মধ্যে থাকি। সাহস গেছে নষ্ট হয়ে। এত বড় একটা ঘটনা আমি দেখলাম। ছেলে তিনটাকে বেরুতে দেখলাম — অথচ কাউকে কিছু বললাম না। ঠিক তোমার মত অবস্থা। ঠিক না হাসান?'

হাসান কিছু বলল না। ইলা বলল, এই জায়গাটা কোন্ থানার আন্ডারে তুমি জান?

'মোহাম্মদপুর থানা।'

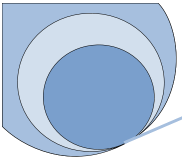
'তুমি আমাকে একটা রিকশা ঠিক করে দাও। আমি প্রথম যাব মোহম্মদপুর থানায়। আমি যা জানি ওদের বলব।'

'এতে লাভ কিছু হবে না ভাবী।'

'লাভ হোক না হোক আমি বলব। অন্যের লাভের ব্যাপার না — আমার লাভ হবে। আমার সাহস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গে সাহস ফিরে পাব। তুমি বোধহয় জান না হাসান, আমি সব সময় খুব সাহসী মেয়ে ছিলাম।'

হাসান একটা রিকশা এনে দিল।

ইলা রিকশায় উঠল। রিকশাওয়ালাকে বলল, হুড ফেলে দিন।



'খুব রইদ আম্মা।'

'থাক রোদ। চারদিক দেখতে দেখতে যাই।'

ইলাকে অনেক জায়গায় যেতে হবে। প্রথমে যাবে মোহাম্মদপুর থানা, তারপর যাবে মা'র কাছে। মা'র সঙ্গে সে ঐদিন খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। আজ মা'কে জড়িয়ে ধরে সে খানিকক্ষণ কাঁদবে। সেখান থেকে যাবে বি. করিম সাহেবের কাছে। সবশেষে যাবে লালবাগ থানায়। অনেক কাজ।

রিকশা এগুচ্ছে। নীল শার্ট পরা চমৎকার চেহারার একটা ছেলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

১১

বি. করিম সাহেব খুশি খুশি গলায় বললেন । আরে এস এস। তোমার নাম তো পরী তাই না? ইলা, বি. করিম সাহেবকে বিস্মিত করে, তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলল। নিচু গলায় বলল, আমার নাম ইলা। শুধু বাবা আমাকে পরী ডাকতেন।

'তোমাকে আমি মনে মনে খুঁজছিলাম। ঠিকানা রেখে যাও নি। ঠিকানা রেখে গেলে নিজেই যোগাযোগ করতাম। তোমার জন্যে সুসংবাদ আছে। মজিদ নতুন নায়িকা ট্রাই করতে রাজি হয়েছে। তার কাছে তোমাকে একদিন নিয়ে যাব। তবে তারও আগে তোমার একগাদা ছবি দরকার। ভাল ফটোগ্রাফার দিয়ে কিছু ছবি তোলাবে। আমি একজন ফটোগ্রাফারের নাম-ঠিকানা দিয়ে দেব। ওকে দিয়ে ছবি তোলাবে। ব্যাটা কাজ ভাল করে। তবে স্বভাব-চরিত্র খারাপ। ছবি তোলা শেষ হলেই ঘাড় ধরে বিদেয় করে দেবে।'

'নায়িকা হবার জন্যে আমি কিন্তু আপনার কাছে আসি নি। আমি আগেও আপনাকে বলেছি। আপনি বোধহয় আমার কথা মন দিয়ে শুনেন নি।'

'তাহলে আস কেন আমার কাছে?'

'এম্নি আসি।'

'কোন কারণ ছাড়াই আমার কাছে আস?'

'কারণ একটা আছে। তবে সেই কারণ আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না।'

'বি. করিম খানিকক্ষণ গম্ভীর ভঙ্গিতে বসে থেকে বললেন, আমি বাংলাদেশের ছবির স্ক্রিপ্ট লিখি। আমার কাছে সব কারণই বিশ্বাসযোগ্য। ব্যাপারটা কি বল।'

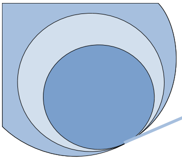
'ভেতরে এসে বলি?'

'এস ভেতরে এস।'

ইলা ঘরে ঢুকল। আজকে ঘরদোয়ার অন্য দিনের মত অগোছালো নয়। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ঘর ঝাঁট দেয়া হয়েছে। বইপত্র ছড়ানোছিটানো নয়। সাজানো। তবে মেঝেতে খবরের কাগজ বিছানো। একটা টিফিন ক্যারিয়ার, থালা গ্লাস। ভদ্রলোক বোধহয় খেতে বসবেন।

'শোন পরী, আমি এখনো ভাত খাই নি। ভাত নিয়ে বসব। তোমার যা বলার তুমি চট করে বলে চলে যাও।'

ইলা হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা বি-টু সাইজের ছবি বের করে এগিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, ছবিটা দেখুন।



করিম সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, দেখলাম।

'আপনার সঙ্গে কি এই ছবিটার মিল আছে না?'

'খানিকটা আছে। তবে এই ভদ্রলোকের চোখ বড় বড়। আমার চোখ ছোট। কার ছবি?'

'আমার বাবার ছবি।'

'ও!'

'বাবা যখন মারা যান তখন আমরা সবাই খুব ছোট। আমার ছোট বোনটার বয়স এক বছর, আমার চার বছর, আর আমার বড় ভাইয়ের বয়স সাত। আমার অবশ্যি বাবার চেহারা মনে আছে।'

'চার বছর বয়স হলে মনে থাকারই কথা।'

ইলা শান্ত গলায় বলল, মানুষের সঙ্গে মানুষে চেহারায় মিল থাকতেই পারে। এটা এমন কিছু না। এটাকে কোন রকম গুরুত্ব দেয়া ঠিক না। তারপরেও আপনার কাছে আসতে আমার ভাল লাগে। আপনি বিরক্ত হন। ভাবেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসছি।

'আর ভাবব না। তুমি বোস। তোমার মুখটা শুকনা লাগছে। তুমি কি দুপুরে কিছু খেয়েছ?'

'জ্বি—না।'

'আমার সঙ্গে চারটা খাবে?'

ইলা কিছু বলল না। চুপ করে রইল। বি. করিম সাহেব বললেন, এস পরী হাত ধুয়ে আস। হোটেলের খাবার। ভাল হবে না। তবু খাও।

ইলা হাত ধুয়ে খেতে বসল। করিম সাহেব খেতে খেতে কৌতূহলী হয়ে মেয়েটিকে দেখছেন। তাঁর নিজেরই খানিকটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

'পরী!'

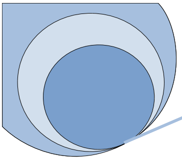
'জ্বি।'

'তোমার যদি কখনো কোন সমস্যা হয় আমাকে বলো। আমার ক্ষমতা এবং সামর্থ্য দুইই সীমিত। তবু আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তোমার কি কোন সমস্যা আছে?'

'আছে। আমার খুব আপন একজন মানুষ লালবাগ থানা হাজতে আটকা আছেন। আপনি তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে পারবেন?'



'কোন্ অপরাধে তাকে ধরা হয়েছে সেটা না জানলে বলতে পারব না। টাকা-পয়সাও লাগবে। এদেশের পুলিশ টাকা ছাড়া কথা বলে না।'

'আমি টাকা নিয়ে এসেছি।'

ইলা করিম সাহেবকে একটা খাম বাড়িয়ে দিল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, এ তো অনেক টাকা।

'জ্বি, অনেক টাকা।'

'কত আছে এখানে?'

'ছাপ্পান্ন হাজার ছিল। আমি কিছু খরচ করেছি — এখন কত আছে জানি না।'

করিম সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তুমি চাচ্ছ ওকে বের করে আনতে যে টাকা লাগে তা এখান থেকে দেব আর বাকি টাকাটা ওর হাতে দেব?

'জ্বি।'

'তুমি চাচ্ছ না যে ব্যাপারটা কেউ জানুক?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

'বেশ। করা হবে। ছেলের নাম দিয়ে যাও। ঠিকানা দাও।'

'খামের ভেতর একটা কাগজে লেখা আছে।'

'তুমি কি ওকে কোন চিঠি দেবে?'

'জ্বি না।'

'তুমি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাও?'

'জ্বি।'

ইলা বলল, আমি এখন উঠব। সে কদমবুসি করবার জন্যে নিচু হল। বি. করিম সাহেব হাসিমুখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভদ্রলোক চিরকুমার। সারাজীবন একা কাটিয়েছেন। তার জন্যে কোন রকম অতৃপ্তি তিনি বোধ করেন নি। আজ করলেন। আজ হঠাৎ করে মনে হল — বিরাট ভুল হয়েছে। সংসার করলে হত। এই মেয়ের মত একটা মেয়ে তাহলে তাঁর থাকত।

'চাচা যাই?'

করিম সাহেবের খুব ইচ্ছা করল বলেন — আবার এস মা। বলতে পারলেন না। দীর্ঘদিন 'মা' ডাকেন না। আজ হঠাৎ করে কাউকে 'মা' ডাকা সম্ভব না। তিনি কোমল গলায় বললেন, আবার এস। ইলা বলল, আমি আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

১২

....

নাসিম কম্বলের উপর শুয়ে ছিল। হাজতে আরো কিছু কয়েদি আছে, তারা মেঝেতে গাদাগাদি করে বসা। কম্বলের বিশেষ ব্যবস্থা নাসিমের জন্যে। তাকে চেনার কোন উপায় নেই — পুলিশী মারের কারণে মুখ ফুলে বিভৎস দেখাচ্ছে। সবচে বেশি ফুলেছে নাক। মনে হচ্ছে নাকের হাড় ভেঙেছে। বাঁ চোখ বন্ধ হয়ে আছে। ডান চোখ অক্ষত তবে লাল হয়ে আছে। পুলিশী মারের ধরন এমন হয় যে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। নাসিমের বেলায় ব্যতিক্রম হয়েছে। মারের কারণেই অন্য হাজতীরা নাসিমের প্রতি মমতা দেখাচ্ছে। কম্বল হচ্ছে মমতার প্রকাশ। হাজতখানার একমাত্র কম্বলটি ভাঁজ করে নাসিমকে দেয়া হয়েছে, যাতে সে শুয়ে থাকতে পারে।

ইলা হাজতের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে। প্রথম দর্শনে সে চিনতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। নাসিম হাসিমুখে বলল, আরে তুই, তুই কোত্থেকে? তোকে কে খবর দিল? আমি বাবুকে এত করে বললাম, তোকে যেন খবর না দেয়া হয়। শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করবি।

'তুমি করেছ কি?'

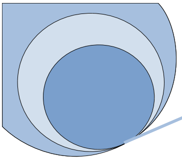
'মিস আন্ডারস্টেনডিং হয়ে গেছে। যাকে বলে ভুল বোঝাবুঝি।'

'তোমাকে এ রকম করে মেরেছে কেন?'

'পুলিশ ধরেছে — মারবে না। তাও তো আমাকে কম মেরেছে।'

'এর নাম কম মারা?'

'বাদ দে বাদ দে। মেয়েছেলের এইসব জায়গায় আসাই ঠিক না। তোরা অল্পতে নার্ভাস হয়ে যাস। বাবুকে এত করে বলেছি যেন কাউকে কিছু না জানায়। সে মনে হয় মাইক নিয়ে ঢাকা শহরে বের হয়ে পড়েছে। দুপুরে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে রুবা এসে উপস্থিত। তারপর বিশ্রী কাণ্ড। টিফিন ক্যারিয়ার ফেলে দিয়ে চিৎকার করে কান্না। হাজতখানা কি কান্নাকাটির জায়গা। দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ তাকিয়ে দেখছে। কাঁদতে হয় বাড়িতে বসে। দরজা বন্ধ করে কাঁদবি। হাটের মধ্যে কাঁদার দরকার কি। বাবুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না — দেখা হলে কঠিন কিছু কথা শুনিয়ে দিতাম।



'ভাইয়া কোথায়?'

'আমাকে বের করার জন্যে — খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে নানান জায়গায় ছোটাছুটি করছে। ভাবটা এরকম যেন আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাচ্ছে। এক্ষুণি এখান থেকে বের করতে হবে। দু'একদিন পরে বের হলে ক্ষতি তো কিছু নেই। এত অস্থির হবার দরকার কি। আর শোন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে তুই খামোকা এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস না। বাসায় চলে যা। তোর কি শরীর খারাপ না-কি তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?'

'আমার শরীর ভালই আছে। নাসিম ভাই তুমি শুয়ে আছ শুয়ে থাক, তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে না।'

নাসিম উঠে দাঁড়াল। ইলা বলল, তোমার বাঁ চোখ এমন ফুলে আছে। চোখে কিছু হয় নি তো?

'চোখ ঠিক আছে। সকালের দিকে ঝাপসা দেখছিলাম — এখন পরিষ্কার দেখতে পারছি।'

'তুমি একদিনও আমাকে দেখতে যাও নি নাসিম ভাই।'

'ছোটাছুটি করেই সময় পাই না। দেখি এইবার যাব। জামান সাহেব ভাল আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁকে আমার সালাম দিবি। অতি ভদ্রলোক। কিছুদিন আগে রাস্তায় একবার দেখা হয়েছিল। আমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে চা-সিঙাড়া খাওয়ালেন। জয়দেবপুরে একটা বাড়ি কিনেছেন বলে বললেন, ঠিকঠাক করছেন। বাড়ির পেছনে পুকুর আছে। আমি জামান সাহেবকে বললাম, আপনি ভাই ঐ পুকুরে কিছু জলপদ্ম লাগাবেন। আমাদের ইলার খুব শখ। লাগিয়েছেন জলপদ্ম?'

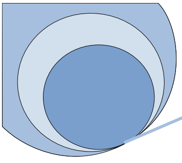
'জানি না। লাগাবে নিশ্চয়ই।'

'অবশ্যই লাগাবে। আমি চারা জোগাড় করে দেব। কোথাও পাওয়া না গেলে বলধা গার্ডেন থেকে জোগাড় করব। কেয়ারটেকারকে ভুজং ভাজং দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। এম্নিতে রাজি না হলে পা চেপে ধরব।'

ইলা হেসে ফেলল। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। অন্যের কাছ থেকে গোপন করার মত পানি নয়। ফোঁটায় ফোঁটায় পানি আসছে।

নাসিম বিস্মিত হয়ে বলল, কি যন্ত্রণা কাঁদছিস কেন? চোখ মোছ।

ইলা শাড়ির আঁচলে চোখ ঢেকে শব্দ করে কেঁদে উঠল। থানার সেকেন্ড



অফিসার কান্নার শব্দে এগিয়ে এলেন। নাসিম অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে। কি করবে বা বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ইলা বলল, নাসিম ভাই আমি যাই।

'আচ্ছা যা। তোর অবস্থা দেখে তো আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি। শরীর মনে হয় বেশি খারাপ। এত অল্পতে কান্নাকাটির মেয়েতো তুই না। তোর সমস্যাটা কি? বল তো?'

'সমস্যা কিছু না। আমার বাচ্চা হবে নাসিম ভাই। তিন মাস যাচ্ছে। কাউকে বলি নি। তোমাকে প্রথম বললাম।'

নাসিমের মুখ হা হয়ে গেল। মেয়েটার কি সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেল? বাচ্চা হবার খবর কি হাটের মধ্যে বলার জিনিস। হাজতীরা কান পেতে শুনছে। কথাবার্তা আরেকটু সাবধানে বলা উচিত না?

নাসিম ইলাকে ধমক দিতে গিয়েও দিল না। নিজেকে সামলে নিল। একটা খুশির কথা বলেছে — এই সময় ধমকাধমকি করা ঠিক হবে না। পরে এক সময় বুঝিয়ে বলতে হবে।

'যাই নাসিম ভাই।'

'অনেকক্ষণ ধরেই তো যাই যাই করছিস। যাচ্ছিস তো না।'

'এইবার যাব। একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করে যাই। আমার বিয়ের দিন আমি তোমাকে সালাম করলাম। তখন তুমি আমার জন্যে কি দোয়া করেছিলে?'

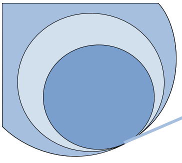
'মনে নেই।'

'মনে করার চেষ্টা কর।'

'তুই বড় বিরক্ত করছিস ইলা, যা বাসায় যা।'

নাসিম সেকেন্ড অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার মেয়েটাকে একটা রিকশা করে দিন। ওর শরীরটা খারাপ। রিকশাওয়ালাকে বলে দেবেন। যেন খুব সাবধানে নিয়ে যায় ঝাঁকুনি না দেয়। মেয়েটা খুবই অসুস্থ।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই সাধারণ কথাগুলি বলতে বলতে নাসিমের গলা ধরে এল। বন্ধ হয়ে যাওয়া ফুলে ওঠা চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।



১৩

ইলা খুব সুন্দর করে সেজেছে। বিয়ের লাল বেনারসীটা পরেছে। ঠোঁটে কড়া করে লিপিস্টিক দিয়েছে। বিয়ের সময় জামান তাকে অনেক গয়না দিয়েছিল আজ সে সবই পরেছে। বিছানায় নীল চাদর বিছিয়ে সে বসেছে মাঝখানে। সদর দরজা খোলা। অন্যদিন দরজা খোলা রাখলে সে ভয়েই মরে যেত। আজ এতটুকু ভয় করছে না। সে পা গুটিয়ে খাটে বসে আছে। অপেক্ষা করছে জামানের জন্যে। তার এগারটায় ফেরার কথা। এগারটা বাজতে খুব বাকি নেই। নীল বিছানায় লাল বেনারসী পরা ইলাকে দেখাচ্ছে জলপদ্মের মত।